সম্পাদনা : সনৎকুমার গুপ্ত

নবপত্র প্রকাশন
৮, পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

আমাদের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, পত্র-পত্রিকায় এই দিব্য-জীবনের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও নবপত্রের এই প্রকাশনার কি তাৎপর্য—এই প্রশ্ন উঠতে পারে।

কোন গভীর তত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ না করে একটি মহৎ জীবনের সত্যকে পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরা-ই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ পাঠের সার-সঙ্কলন—এখানে-ওখানে ছড়ান ফুলগুলো দিয়ে একটি মালা-গাঁথার কাজ! বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য উক্তিগুলোর দিকে—কেননা ওখানেই মিলবে তিনি কিভাবে ধর্মসাধনাকে জীবনের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন তার নির্দেশ। খুবই ক্ষুদ্র পরিসরের ফ্রেমে এক বিশাল-সাগরের প্রতিচ্ছবি ধরে রাখা। পাঠক বিচার করবেন এই ব্রতে আমরা সফল হয়েছি কিনা। সব উক্তিই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত। 'যত মত তত পথ', তিনি বলেছিলেন—সব ধর্মীয় সাধনার তাৎপর্য উপলব্ধির করার পরে। তাঁর উপলব্ধির বাইরে কোন কথা নেই।

সকল গ্রন্থেরই ভূমিকা হয়—আমরা ভূমিকা লিখতে বসিনি। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশের দিকে তাকালে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, সমস্ত বাক্‌চাপল্য ধীরে-ধীরে মন্থর হয়ে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল জীবন বর্ণনাতীত—আমরা বর্ণনার স্পর্ধা করি না। আমাদের লক্ষ্য এই মহাপুরুষের জীবনের মধ্যেই তাঁর সন্ধান করা, তাঁর উক্তির মাধ্যমেই তাঁকে বোঝার চেষ্টা। আমাদের প্রচেষ্টা—অনেকটা 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি যদি এই গ্রন্থনায় স্পষ্ট হয়ে থাকে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : রাণী রাসমণি ৯

দ্বিতীয় পর্ব : দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬

তৃতীয় পর্ব : কথামৃত ৪৮

চতুর্থ পর্ব : সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৪

পঞ্চম পর্ব : স্তোত্রগীতি ৯১

ষষ্ঠ পর্ব : শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর ১০৩

দক্ষিণেশ্বর মন্দির : রাণী রাসমণি :
রামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিকর :
বিবিধ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের কালরেখা ১০৯

শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায
সাং কামারপুকুর

দক্ষিণেশ্বরের
মন্দির

রাণী রাসমণি

মথুরামোহন বিশ্বাস

যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসারদা মা

স্বামী বিবেকানন্দ

সর্বধর্মসমন্বয়
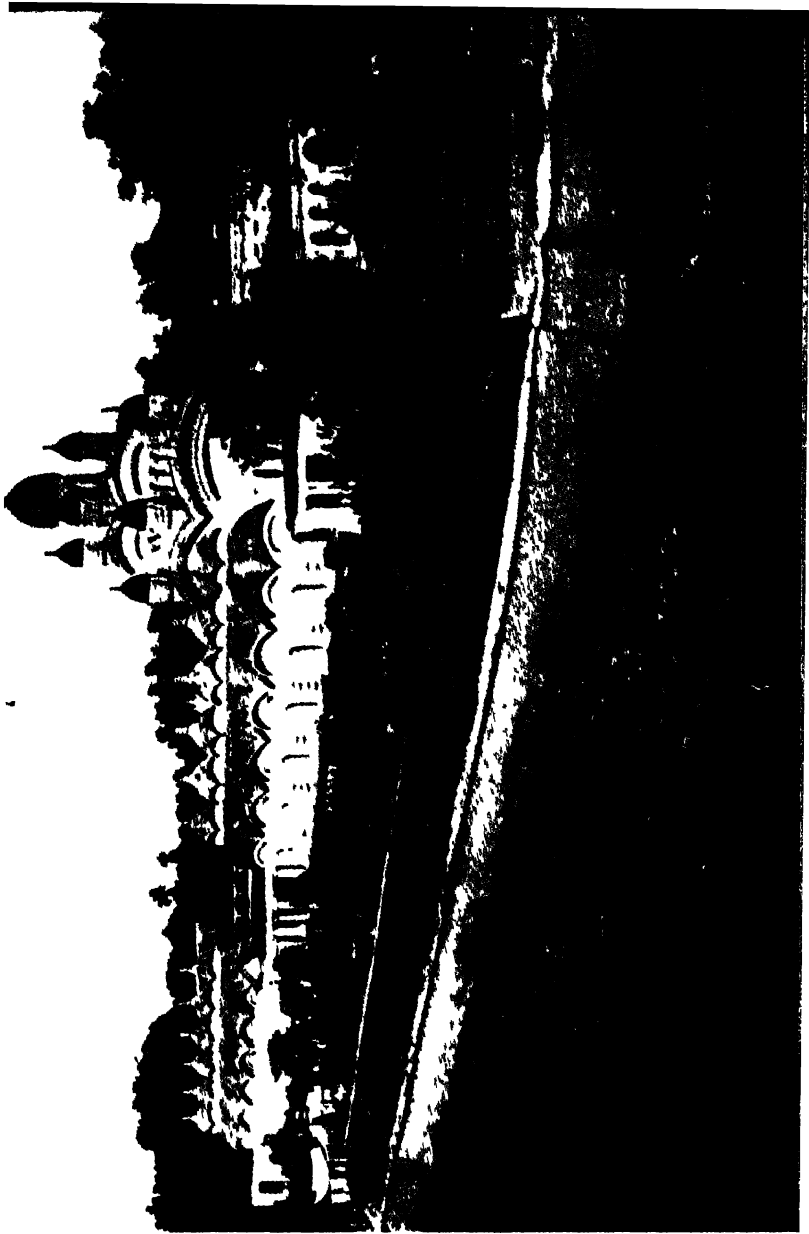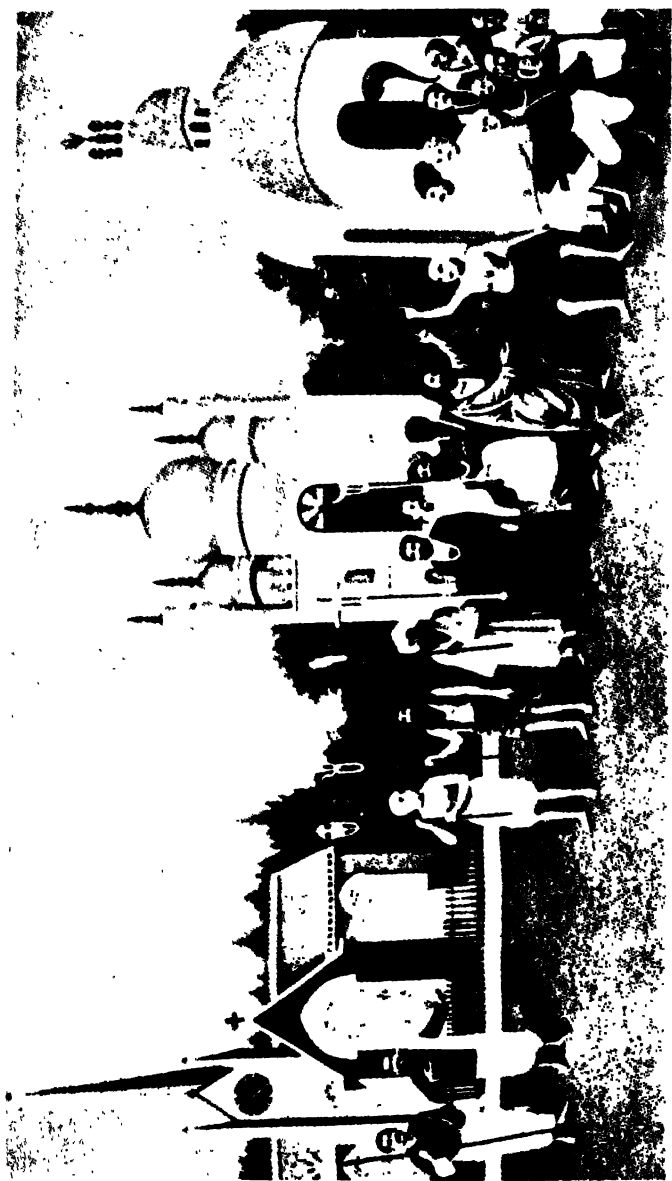
স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল)

স্বামী শিবানন্দ (তাবক)

স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম)

স্বামী যোগানন্দ (যোগীন)

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ (নিরঞ্জন)

স্বামী সারদানন্দ (শরৎ)

স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল)

স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু)

স্বামী তুরিয়ানন্দ (হরি)

স্বামী অভেদানন্দ (কালী)
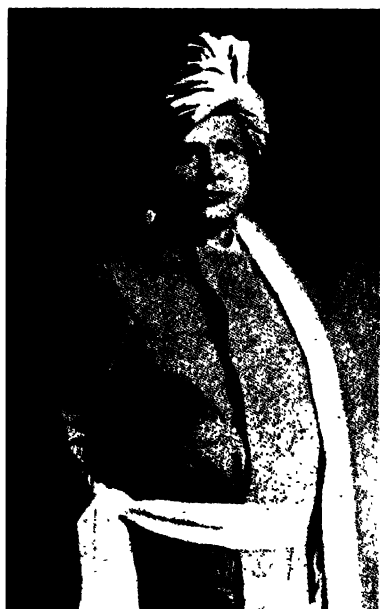
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা)

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)

প্রথম পর্ব

রাণী রাসমণি

এক

প্রথম পত্তনের সময় থেকে কলকাতা শহরের বয়স এখনও তিনশো বছর পেরোয়নি। এর যে আধুনিক রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তারও বয়স খুব বেশি দিনের নয়—এক শতাব্দীর কিছু উপরে। মাত্র একশো পঁচিশ বছর আগে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যবতী রাণী রাসমণি।

রাসমণি কৈবর্ত-কন্যা—কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত। ইনি বর্তমান হালিশহরে কোনা গ্রামের অধিবাসী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা। কিন্তু এই দরিদ্র ঘরের কন্যা যে ঘরে বধূরূপে এসেছিলেন তা তখনকার কলকাতার এক বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার।

ভাগ্যের অন্বেষণে বিদেশী বণিকের জমিদারী এলাকায় বহু পরিবার বাইরে থেকে এসে শহরের প্রথম পত্তনের সময় থেকেই বাসা বাঁধতে শুরু করেছিলেন।

বর্তমান ধর্মতলা অঞ্চল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ও রাণী রাসমণি রোড—এ অঞ্চলটি সেকালে জানবাজার নামে পরিচিত ছিল। এইখানেই স্থায়িভাবে ব্যবসা করতে এসেছিলেন মাহিষ্য-জাতির কান্তচন্দ্র মাড়।

এই পরিবারের প্রীতিরাম মাড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—রাজচন্দ্র দাস প্রীতিরাম মাড়েরই দ্বিতীয় পুত্র। দরিদ্র পরিবারের পরমা সুন্দরী কন্যা রাসমণির বিবাহ হয়েছিল রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে।

তখন রাসমণির বয়স মাত্র এগার বছর। রাজচন্দ্র বিত্তশালী,

ব্যবসায়ী কিন্তু সুশিক্ষিত; শুধু তাই নয় তিনি কলকাতার অভিজাত সন্তানাদির মধ্যে ইংরেজের আদালতে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। রাসমণির যা কিছু শিক্ষা স্বামীর কাছেই।

বাংলা ১২৪০ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর চার কন্যা নিয়ে রাসমণি বিধবা হলেন; কিন্তু তখন তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী।

অসহনীয় দারিদ্র্য থেকে ঐশ্বর্যের তুঙ্গ শিখরে!

সাধারণ মানুষ এরকম অবস্থায় ভোগে মত্ত হয়, বিলাসলীলায় কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, নানাভাবে নানাদিকে ঐশ্বর্যের অপচয় হতে থাকে। কিন্তু রাসমণি দৃঢ়হস্তে হাল ধরলেন—দানে, লোককল্যাণে ও অজস্র সৎকার্যে সঞ্চিত অর্থকে সার্থক করে তুলতে লাগলেন।

ঐ আমলের একটি সংবাদপত্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রে (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১) লিখেছিলেন:

'আমি কলকাতার জানবাজার নিবাসী ৺বাবু রাজচন্দ্র দাসের গুণবতী ভার্যা সুশীলা শ্রীমতী রাসমণি দাসীকে তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক বিপুল ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন জানাইতেছি যে গত চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে প্রাগুক্তা শ্রীমতী নবদ্বীপে উপস্থিতা ছিলেন, গ্রহণকালীন ৺সুরধুনী তটে ৪০০০ চারিসহস্র তঙ্কা নগদ ও প্রায় পাঁচশতখানা রক্তবর্ণ বনাত উৎসর্গ করিয়া নবদ্বীপ নিবাসী প্রত্যেক পণ্ডিতকে ঐ মুদ্রা ও বনাত বিতরণ করিয়াছেন ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম শিরোমণি, মাধব তর্কসিদ্ধান্ত, গোলকনাথ ন্যায়রত্ন, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতিকে পঞ্চাশ তঙ্কা নগদ ও একখানা বনাত প্রদান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা ঐ দান বিশেষ সন্তুষ্টতার সহিত গ্রহণপূর্বক পুণ্যবতী শ্রীমতী রাসমণি দাসীকে সর্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্বাদ করিতেছেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'ও একটি দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদ থেকে আমরা দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির

মন্দির প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পেরকথা জানতে পারি। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকরে লেখা হয়েছিল :

'আমরা পরমানন্দে প্রকাশ করিতেছি সুশীলা, দানশীলা, দয়াময়ী শ্রীমতী রাসমণি জানবাজার হইতে মোলালির দর্গা পর্যন্ত জলপ্রণালী নির্মাণার্থ নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক দ্বিতীয় ভাগের কমিশনারের হস্তে ২৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, তৎকার্য নির্বাহার্থ আর বড় বিলম্ব হইবেক না। এবিষয়ে শ্রীমতী সাতিশয় যশস্বিনী হইয়াছেন। অপিচ, ইনি বহুলোকের উপকারার্থ হুগলির ঘোলঘাটের পার্শ্বে বহু ব্যয়পূর্বক যে এক নয়ন-প্রফুল্লকর ঘাট প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে দর্শকমাত্রেই সন্তোষসাগরে অভিষিক্ত হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আমরা শুনিতেছি, উক্তা গুণযুক্তা শ্রীমতী আগামী বৈশাখী পূর্ণমাসী তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্তি স্থাপিতা করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবালয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন এবং পবিত্র কার্যোপলক্ষে কত অর্থব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনির্বচনীয়।'

অবশ্য সাধারণের কাছে এই সঙ্কল্প ঘোষণার তিন বছরেরও অধিক সময় পরে ১২৬২ সালে স্নানযাত্রার দিন (১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে) দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিলম্বের কারণ—রাসমণি কৈবর্ত কন্যা—সমাজের শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের বিচারে তিনি দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় ও সেবায় অনধিকারিণী।

কিন্তু রাসমণির কঠিন সঙ্কল্পের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে বাধার তরঙ্গ ফিরে গেল। শুধু লোককল্যাণকামনা নয় তেজস্বিতাও তাঁর চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—এ সম্পর্কে বহু কাহিনী তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, রাসমণির বাড়ির কাছেই ছিল ইংরেজ-

সেনার একটি ব্যারাক। সুরাপানে মত্ত সৈনিকদল একবার জোর করে তাঁর বাড়িতে এসে লুটপাট করতে শুরু করে। তখন বাড়িতে পুরুষ কেউ ছিল না; সৈনিকেরা বাধা না পেয়ে যখন অন্দরে প্রবেশ করল তখন তিনি নিজেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

আরও শোনা যায়, পূজোর সময় রাসমণির বাড়ির সামনে যে ঢাকের বাজনা হতো, ইংরেজেরা শব্দ-মহিমা সইতে না পেরে ঢাক-বাজনা বন্ধ করে দেন। রাসমণির ব্যবস্থায় ঢাকের শব্দ পূর্ববৎ চলতে লাগল, শুধু বাড়ির সামনের পথে ইংরেজদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল।

শব্দ-বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত আপোষ করেছিল।

গঙ্গায় মাছ ধরার ব্যাপার নিয়েও একবার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রাসমণির বিরোধ বেধেছিল। মাছ ধরতে হলে জেলেদের কর দিতে হবে—এ-ই ছিল বিধান।

করভারে উৎপীড়িত জেলের দল এল তাদের রাণী রাসমণির কাছে। সব কথা শুনে রাণী তাদের অভয় দিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সরকারের কাছ থেকে গঙ্গায় মাছ ধরার ইজারা নিলেন। তারপর গঙ্গার কয়েকটি অংশে এককূল থেকে অন্যকূল পর্যন্ত তিনি এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে দিলেন যে ইংরেজের জাহাজ যে নদীপথে প্রবেশ করবে তার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

ইংরেজ সরকার প্রতিবাদ জানাল। রাসমণি উত্তরে জানালেন—আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নদীতে মাছ ধরবার অধিকার পেয়েছি, সেই অধিকারের বলেই এই ব্যবস্থা করেছি। নদীর পথে জাহাজ গেলে মাছ পালিয়ে যাবে—তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি। তাই নদী-পথ শৃঙ্খলমুক্ত করা যাবে না; তবে জেলেদের উপরে যে কর চাপানো হয়েছে তা যদি তুলে নেওয়া হয়, আমি আমার অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকব।

বলা বাহুল্য, সরকার এর পর কর তুলে নিয়েছিলেন।

লোকহিতকর কাজে রাণী রাসমণির উৎসাহের অন্ত ছিল না। সোনাই বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার বসাতে হবে; কালীঘাটে ঘাট আর মুমূর্ষুদের জন্য আবাস তৈরি করতে হবে; হালিশহরে গঙ্গাতীরে ঘাটের ব্যবস্থা—সুবর্ণরেখার অপর তীর থেকে কিছুদূর পর্যন্ত পথ নির্মাণ—সর্বত্র রাণী রাসমণির কল্যাণহস্ত প্রসারিত।

রাণী রাসমণি আমরা বলে থাকি; কিন্তু কোন্ রাজ্যের রাণী তিনি? চরিত্র-মহিমায়, বিচিত্র কল্যাণকর্মে তিনি ছিলেন সকলের হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ মানুষই তাঁকে রাণীর মর্যাদা দিয়েছে, রাণী বলে ডেকেছে। আমাদের দেশে এভাবে রাজা ও রাণী অল্পজনই হতে পেরেছেন।

দুই

দেবী কালিকার প্রতি রাসমণির ভক্তি অসীম। জমিদারী কাগজপত্রে নিজের নামাঙ্কিত করবার জন্য তিনি যে শীলমোহর তৈরি করেছিলেন তাতে খোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।'

বহুকাল যাবৎ তাঁর মনে একটি সাধ ছিল—কাশীধামে গিয়ে তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করবেন এবং বেশ একটু ঘটা করেই তাঁদের পূজা দেবেন।

কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহন ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত—তাঁর সাহায্যে যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু যাত্রার আগের দিন রাত্রিতে স্বপ্নে তিনি দেবীর দর্শন এবং প্রত্যাদেশ পেলেন—কাশী যাওয়ার দরকার নেই, ভাগীরথীর তীরে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর, আমি নিত্য তোমার হাতে ভোগ ও পূজা গ্রহণ করব।

কেউ কেউ বলেন, এই প্রত্যাদেশ তিনি পেয়েছিলেন যাত্রার পর। তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিলেন—পরে নৌকায় রাত্রিবাস করার সময়ে এই প্রত্যাদেশ পান।

সে যা-ই হোক দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীতীরে ষাট বিঘা জমি কেনা হয়ে গেল। বহু অর্থব্যয়ে সেখানে মন্দির নির্মাণ শুরু হল।

দেবীকে অন্নভোগ দেবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রধান বাধা—সামাজিক বিধি।

কিন্তু তিনি হীনজাতি বলেই তাঁর প্রদত্ত অন্নভোগ দেবী গ্রহণ করবেন না—এই নিষ্ঠুর প্রথা তাঁর মন মেনে নেয়নি। তিনি নানাস্থান থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিধান আনালেন কিন্তু কোথাও উৎসাহ পেলেন না।

মন্দির নির্মাণ, মূর্তিগঠন শেষ হয়ে এল কিন্তু রাণী রাসমণির সঙ্কল্প পূরণের কোন আশা দেখা গেল না।

এমন সময় ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠী থেকে এক ব্যবস্থাপত্র এল—প্রতিষ্ঠার আগে রাণী যদি সেই সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তবে শাস্ত্রবিধির মর্যাদা যথারীতি রক্ষিত হবে।

ব্যবস্থা পেয়ে রাণী স্থির করলেন, নিজের গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করবেন এবং নিজে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করে থাকবেন।

তবু প্রথাপূজকের দল খুশি হলেন না।

কেউ বললেন—এ কাজ সামাজিক প্রথার বিরোধী। কেউ বললেন—এভাবে কাজ করলে কোন সজ্জন এখানে প্রসাদ গ্রহণ করবেন না। কিন্তু একাজ শাস্ত্র-বিরোধী—একথা আর কেউ বলতে সাহসী হলেন না।

ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী থেকে যিনি রাণী রাসমণিকে এই উদার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তাঁর নাম রামকুমার ভট্টাচার্য। সেই যুগে এই ব্যবস্থাদান যেমন উদারতা তেমনি সৎসাহসেরও পরিচয় বহন করে। এই ঘটনায় রামকুমারের প্রতি রাসমণির দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু আবার বাধা এল—এই দেবালয়ের কার্যভার গ্রহণ করবেন, কে সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত ?

কেউ স্বীকৃত হলেন না সেই শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের পূজক-পদ গ্রহণ করতে। তখন পূজকের জন্য নানাস্থানে সন্ধান চলতে লাগল।

দেবী প্রতিষ্ঠার দিন নিকটবর্তী—যোগ্য লোকও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিরুপায় রাসমণি রামকুমারকে জানালেন—'আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি দেবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছি। আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভমুহূর্তে ঐ কাজ সমাধা করবার সমস্ত আয়োজন করেছি। কিন্তু কোন সদ্ ব্রাহ্মণ কালীমাতার পূজকপদ গ্রহণে সম্মত হচ্ছেন না।। সুতরাং আপনিই অনুগ্রহ করে এবিষয়ে একটি ব্যবস্থা করুন।

রাণীর কর্মচারী মহেশ এসেছিলেন পত্র নিয়ে রামকুমারের কাছে।

ভক্তিমান রামকুমার দেখলেন পূজকের অভাবে নির্দিষ্ট দিনে দেবী-প্রতিষ্ঠার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি সম্মত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন।

দেবীভক্ত রামকুমার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানতে পেরেই সম্মতি দিয়েছিলেন কিনা কে বলতে পারে ?

দ্বিতীয় পর্ব

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ

এক

হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—এই দুটি জেলার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেই সন্ধিস্থলের কাছেই তিনটি গ্রাম—শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর।

গ্রাম তিনটি এত ঘননিবদ্ধ যে পথিকের কাছে মনে হবে একই গ্রামের তিনটি পল্লী।

পরে গ্রাম তিনটি কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কামারপুকুরের এই সৌভাগ্যের কারণ সম্ভবতঃ এই যে স্থানীয় জমিদারগণ ঐ গ্রামেই বাস করতেন।

কামারপুকুর বর্ধমান শহর থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে নিঃস্ব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরে এসে সংসার রচনা করলেন—তাঁর সঙ্গে স্ত্রী চন্দ্রাদেবী, দশ বছরের পুত্র রামকুমার আর চার বছরের কন্যা কাত্যায়ণী। পৈতৃক ভিটা ও জমিজমা ছিল 'দেরে' গ্রামে, জমিদারের উৎপীড়নে তাঁকে সর্বহারা হতে হয়।

ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে অন্নের অভাব ছিল না।

ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ পুত্র—গদাধর।

গদাধর নিয়মিত পাঠশালায় যায় কিন্তু প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে উদাসীন। এদিকে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সে এমন তন্ময়ভাবে ভক্তির সঙ্গে পাঠ করত যে তা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত।

কালক্রমে ক্ষুদিরাম পরলোক গমন করলেন। মধ্যম পুত্র রামেশ্বর

কৃতবিদ্য, কিন্তু তাঁর তেমন উপার্জন ছিল না। কাজেই সংসারে আর আগের মত সচ্ছলতা রইল না। এরপর পত্নীর পরলোক গমনে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার অবসন্ন হয়ে পড়লেন। অর্থাগমের পথ নেই, এদিকে দিনে দিনে ঋণের অঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে। কোথায় গেলে অর্থ-লাভের সম্ভাবনা তা ভেবে তিনি স্থির করলেন' কলকাতায় গিয়ে ঝামাপুকুরে টোল খুলবেন।

ঝামাপুকুরে টোল খোলা হল। রামকুমারের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে টোল গড়ে উঠল—ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। কলকাতায় এলেও কামারপুকুরের সংসার সম্পর্কে তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। বছরের শেষে তিনি একবাব করে সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করে আসতেন।

একবার মা এবং মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির কবলেন—গদাধরকে কলকাতায় নিজের কাছেই রাখবেন।

তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে ওঁবা যাত্রা করে এলেন কলকাতায়। গদাধরের বয়স তখন সতেরো।

রাণী বাসমণির আমন্ত্রণমন্ত্র পেয়ে যখন বামকুমার দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল যুবক গদাধর।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন উৎসবের সমারোহ! সেদিন ছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব—আজ দক্ষিণেশ্বর জগতের এক মহাতীর্থ। কিন্তু যিনি একে তীর্থভূমিতে পরিণত করবেন তিনিও যে সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—এই আশ্চর্য যোগাযোগ ও সমাবেশ-ব্যাখ্যারও অগম্য!

রাণী রাসমণি কোন ব্যবস্থাতেই ত্রুটি রাখেন নি। রামকুমারের সহায়তায় ও সমর্থনে তাঁর এতদিনের সঙ্কল্প পূর্ণ হতে চলেছে—তাই তাঁব আনন্দের সীমা ছিল না। সেদিনকার সেই উৎসবের বিবরণ দিতে গিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিলেন—

'জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে

দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই পুণ্যকর্ম উপলক্ষে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিব স্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য, পট্টবস্ত্র, নগদ টাকা দিয়াছেন, তারামূর্তি স্থাপনোপলক্ষে যে-যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল। আহারাদির কথা কি বলিব? কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫০০ মন সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতিরমণীয় রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল। ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয় বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্যন্ত, রাস্তার উভয় পার্শ্বে বান্ধা রোশনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

'পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছে। গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়িই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কাঙ্গালী লোক অনেক গিয়াছিল। তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা, কেহ অর্ধমুদ্রা, কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন। এই পুণ্যকার্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক।

'অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ প্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই। জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী করিয়াছেন সেই প্রকার মহৎ অন্তঃকরণ দিয়াছেন। এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্তি সংস্থাপিত রহিল।

(সংবাদ প্রভাকর ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২)

দুই

আর একটি যুবকও এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের গদাধরের সঙ্গ নিয়েছিল। সে গদাধরের পিসতুতো বোনের ছেলে—হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

হৃদয় দেখতে সুপুরুষ—দীর্ঘাকৃতি, বয়স ষোলো। তার দেহ যেমন বলিষ্ঠ, মনও তেমনি উদ্যমশীল ও নির্ভীক। উদাসীন ও ভাবুক গদাধরের যোগ্য সঙ্গী।

শেষ পর্যন্ত জামাতা মথুরবাবুর ব্যবস্থায় এই স্থির হলো—রামকুমার তো পূজকপদে আছেনই—গদাধরকে নিতে হবে বেশকারের কাজ। আর হৃদয় দু-জনকে সাহায্য করবে। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই এই ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে আসার পর রামকুমার অন্যদিকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেও একটি বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। তিনি দেখতেন গদাধরের নির্জন-প্রিয়তা আর দেখতেন সব বিষয়ে তাঁর একটা উদাসীন ভাব। হয়তো দেখতেন, সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন গদাধর দূরে গঙ্গাতীরে একা বিচরণ করছে, হয়তো পঞ্চবটীমূলে স্থির হয়ে বসে আছে; কিংবা হয়তো পঞ্চবটীর চারদিকে যে জঙ্গল-ঢাকা জায়গাটা ছিল, গদাধর সেখানে প্রবেশ করেছে—তারপর অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে আসছে।

রামকুমার চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, তাঁর নিজের দেহটাও দিন দিন অপটু হয়ে পড়ছে। সুতরাং সব কিছু গদাধরকে শিখিয়ে যাওয়া দরকার।

একদিন মথুরবাবু জানতে চাইলেন গদাধরকে দেবালয়ে নিযুক্ত করা যায় কিনা। রামকুমার সানন্দে সম্মত হলেন—এবং তখন থেকে তাঁকে চণ্ডীপাঠ, কালিকাপূজা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা শেখাতে লাগলেন। শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য এসে তাঁকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

এখন থেকে রামকুমার ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবার ভার নিজে নিয়ে কালীমাতার পূজায় নিযুক্ত করতে লাগলেন তরুণ পুরোহিত গদাধরকে। মথুরবাবুর অনুরোধেই এই ব্যবস্থা করা হলো। তারপর একদিন তিনি হৃদয়কে রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্য গৃহে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু গৃহে তার ফেরা হলো না। কলকাতার উত্তরে শ্যামনগর-মূলাজোড় তাঁকে যেতে হয়েছিল। সেইখানেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে তিনি পরলোক গমন করেন।

এদিকে গদাধর আরও তন্ময়চিত্তে নিজেকে ঢেলে দিলেন দেবীর পূজায়। তাঁর পূজার পদ্ধতি ছিল নতুন; তিনি মাকে রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত রচিত গান গেয়ে শোনাতেন; ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে ডেকে বলতেন—'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমাকে দেখা দিবি না কেন? আমি ধন জন ভোগ সুখ কিছুই চাই না, তুই আমায় দেখা দে!' দেবীর পূজা ও সেবায় তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, কতক্ষণ যে বসে আছেন সে খেয়াল থাকত না। পূজা করতে বসে হয়তো নিজের মাথায় ফুল দিয়েই ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন। ভোরে ফুল তুলে এনে মাকে সাজিয়ে দিতেন—কখনও বা ভাববিহ্বল-কণ্ঠে গানের-পর-গান গাইতে থাকতেন—সময় যে চলে যাচ্ছে সে খেয়াল থাকত না।

এই প্রথা বহির্ভূত পূজা-পদ্ধতিতে অনেকেই বিরূপ হয়ে উঠলেন। কিন্তু মথুরবাবু নিজে দেখে খুশি হয়েছিলেন: তিনি রাণী রাসমণিকে বলেছিলেন—অদ্ভুত পূজক, এঁর পূজায় দেবী নিশ্চয়ই শীঘ্র জাগ্রতা হয়ে উঠবেন।

হৃদয় বলত—'কখনও দেখতাম, তিনি পূজার আসন ত্যাগ করে সিংহাসনের উপর উঠে দাঁড়িয়েছেন, তারপর মাতার চিবুক ধরে আদর, গান, পরিহাস বা বার্তালাপ, কখনও বা মূর্তির হাত ধরে নৃত্য।

'কখনও দেখতাম, ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে থালা থেকে এক

গ্রাস অন্নব্যঞ্জন নিয়ে মার মুখে স্পর্শ করিয়ে বলতেন—'খা মা খা, বেশ করে খা ; পরে হয়তো বললেন—আমি খাব ? আচ্ছা, খাচ্ছি।' এই ব'লে ভোগের থেকে কিছু তুলে নিয়ে নিজের মুখে দিয়ে বাকীটা মা'র মুখে দিয়ে বলতেন—আমি তো খেয়েছি—এই বার তুই খা !'

পূজকের এই অভিনব পূজা-পদ্ধতি যাদের চোখে পড়ল তারা পরমহলে অভিযোগ জানাল। মথুরবাবু শুনলেন ; একদিন কালীকামন্দিবে প্রবেশ করে ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলেন। মাকে নিয়েই ঠাকুর তন্ময়—মন্দিরে কে আসছে, কে যাচ্ছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

মথুরামোহন সমস্ত ব্যাপারটির গভীরতা উপলব্ধি করলেন। জগন্মাতার কাছে ঠাকুরের শিশুর ন্যায় আবদার, কখনও চোখে অশ্রুধারা, কখনও আনন্দের উদ্দাম প্রকাশ, আবার কখনও সংজ্ঞা-হীনতা—সব কিছু দেখে মথুরামোহনের মনে হলো—মন্দির যেন দেবীর প্রকাশে সার্থক হয়ে উঠেছে। এই ত যথার্থ পূজা !

মথুরামোহন পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে গেলেন। মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর কাছে তাঁর নির্দেশ এল—পুরুতমশাই যেভাবেই পূজো করুন, তাকে কেউ বাধা দিয়ো না।

বৈধী-ভক্তি তাব বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করেছে—এবার রাগানুগা ভক্তির সাধন !

তিন

পূজক গদাধরের পূজার কথা মথুরামোহনের কাছে রাণী রাসমণিও শুনেছিলেন—তার মনে আনন্দই হয়েছিল সব বুঝতে পেরে। পূজক ঠাকুরের অদ্ভুত ভাবাবেশ ও তন্ময়তার কথা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

পূজার সঙ্গে থাকত তাঁর প্রাণের উচ্ছ্বাস-ভরা মধুর কণ্ঠের গান। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেই পূজককে ডাকিয়ে তাঁর গান শুনতেন।

একদিন মন্দিরে রাসমণি গান শুনছেন—শুনতে শুনতে তিনি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। গান করতে করতে ঠাকুর তা লক্ষ্য করলেন। হঠাৎ ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, রাণীর অঙ্গে আঘাত করে বলে উঠলেন—এখানেও ঐ চিন্তা!

রাণী বিস্মিত হলেন। সত্যিই তো! তিনি তখন গানে মন না দিয়ে নিজের বিষয় সম্পর্কিত একটি মামলার ফলাফলের কথা ভাবছিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন না, বরং নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর মনে হলো—পূজক ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় তিনি পেয়েছেন।

কিন্তু পরে দেখা গেল জগন্মাতাকে নিয়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ এত গভীর যে দেবী সেবার নিত্যক্রিয়া তাঁর পক্ষে সমাধা করা কঠিন হয়ে উঠল। ভাবাবেশে বিভোর থেকে তিনি যখন যেমন ইচ্ছে সেবা করতেন; কিংবা ধ্যানে তন্ময় হয়ে নিজের পৃথক অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গিয়ে পূজার জন্য আনীত ফুল চন্দনে নিজেব অঙ্গ শোভিত করতেন।

এই অবস্থায় ঠাকুরের পক্ষে নিত্যপূজা অসম্ভব, এই ভেবে মথুরবাবু স্থির করলেন, পূজার জন্য অন্য ব্যবস্থা করবেন। ১২৬২সালে পূজকপদ গ্রহণ করেন গদাধর, চার বছর পর ১২৬৫ সালে পূজকপদে এলেন শ্রীরামতারক চট্টোপাধ্যায়। এঁর নিয়োগ অবশ্য গদাধর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত। রামতারক ছিলেন গদাধরের খুড়তুতো ভাই। গদাধর এঁকে বলতেন 'হলধারী'।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনকাল মোটামুটি বারো বছর। প্রথম চার বছরে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ। এই ব্যাকুলতা সম্বল করেই তিনি জগদম্বার দর্শন লাভ করেছিলেন। এই ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁর আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয়, দেহের ও মনের সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাস যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে গদাধর পূজার কাজ ছেড়ে দিয়েছেন এই সংবাদ এল কামারপুকুরে তাঁর মাতা ও মধ্যম ভ্রাতার কাছে। উদ্বেগে অধীর হয়ে মাতা পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেন।

বাড়ীতে এসে গদাধর সাধারণভাবে প্রকৃতিস্থ থাকলেও মধ্যে মধ্যে 'মা-মা' রবে আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করতেন, আবাব কখনও বা ভাবাবেশে জ্ঞান হারাতেন। মাতা চন্দ্রাদেবী ওঝা আনিয়ে ঝাড়ফুঁক করালেন, পরে গদাধরের বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বিবাহ ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষে—পাত্রী কামারপুকুরের দু-ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামেব রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যা সারদেশ্বরী। পুত্রেব বিবাহ দিয়ে মাতা নিশ্চিন্ত হলেন।

বিবাহের পর প্রায় এক বছব সাতমাস কামারপুকুরে কাটিয়ে গদাধর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সংসারে অভাব, তাই আগের মতোই তিনি মন্দিরে সেবাকার্যে ব্রতী হলেন।

এদিকে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন রাণী রাসমণি। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে বাণী দক্ষিণেশ্বরে দেবী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়াবি ঐ সম্পত্তির দেবোত্তর দানপত্রে স্বাক্ষর করার পবদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন কবলেন।

দক্ষিণেশ্বরেব দেবীপূজা সংক্রান্ত সকল বিষযেব দায়িত্ব গ্রহণ করলেন জামাতা মথুরামোহন।

পূর্বেই দাস্যভক্তি সাধনায় এবং হঠযোগ সাধনায় ঠাকুর অগ্রসর হয়েছিলেন—এবার শুরু হলো তন্ত্র সাধনা; বাৎসল্য ও মধুর ভাবেব সাধনা। সব সাধনাতেই তাঁর সিদ্ধি হলো।

মধুর ভাবেব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন ভাবসাধনের চরমভূমিতে; এখন তাঁর মনে এল সর্বভাবাতীত বেদান্তের অদ্বৈতভাব সাধনে প্রবল প্রেরণা।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁর বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতেই বাস করছিলেন—জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাগীরথীতীরে কাটাবেন এই তাঁর কামনা। সেই সময়ে হলধারী নিযুক্ত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবায়।

আর একটি যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে পরিব্রাজক তোতাপুরী মধ্যভারত থেকে ভ্রমণ করতে করতে এসেছিলেন বাংলায়—স্থির করেছিলেন ফিরে যাবার পথে দক্ষিণেশ্বরে তিনদিন থেকে যাবেন।

কালীবাড়িতে এসে ঘাটের বৃহৎ চাদনীতে এলেন তোতাপুরী। ঠাকুর সেখানে বসেছিলেন অন্যমনে। তাঁর তপোদীপ্ত দেহের দিকে তাকিয়ে তোতাপুরী আকৃষ্ট হলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, এই ব্যক্তি সামান্য পুরুষ নন। তন্ত্র-প্রধান বঙ্গে বেদান্তের এমন অধিকারী আছে জেনে তিনি বিস্মিত হলেন—কাছে এসে প্রশ্ন করলেন তুমি উত্তম অধিকারী, বেদান্ত সাধন করবে? ঠাকুর বললেন—আমার মা সব জানেন, তাঁর অনুমতি পেলে করবো।

তোতাপুরী বললেন—তবে যাও, তোমার মাব অভিমত জেনে এস।

তোতাপুরী প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে ঠাকুরের এই মা 'জগন্মাতা'। যাই হোক, মা'র অনুমতি নিয়ে এসে ঠাকুর তোতাপুরীর কাছে দীক্ষিত হলেন।

কিন্তু বেদান্ত সাধনায় উপদেশ গ্রহণের পূর্বে তাঁকে যে শাস্ত্রানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে—তার কি উপায়?

ঠাকুর বললেন—সন্ন্যাস নেব, কিন্তু গোপনে। আমার বৃদ্ধা মাতা আছেন, তিনি আঘাত পাবেন।

সেই ব্যবস্থাই হলো।

রাত্রির অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে ঠাকুর পঞ্চবটীস্থ নিজের সাধন কুটীরে এলেন। হোমাগ্নি জ্ব'লে সর্বস্বত্যাগের মন্ত্র ধ্বনিতে পঞ্চবটী

মুখরিত হয়ে উঠল। শিষ্য প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিলেন।

সন্ন্যাসদীক্ষা সমাপনের পর তোতাপুরী দীক্ষিত শিষ্যের নূতন নামকরণ করলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ।

এরপর শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ তোতাপুরী তিনদিন নয়, একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করলেন।

চার

তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে হিন্দুসংসারত্যাগীদের মতো মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল—জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিরাই এখানে সমান অভ্যর্থনা লাভ করতেন। এইখানে একদিন এলেন সুফি ধর্মাবলম্বী গোবিন্দ রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মন ইসলামধর্মের দিকে আকৃষ্ট হলো। তিনি ভাবলেন—এও তো ঈশ্বর লাভের একটি পথ—এই পথেরও ইতিহাস জানতে হবে। তিনি গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হয়ে ইসলামধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হলেন।

বেদান্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর থেকেই ঠাকুরের মন যে অন্য ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল সুফি গোবিন্দ রায়ের নিকট দীক্ষাই তার নিদর্শন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ব্যবধানের প্রাচীর রয়েছে, বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যে তা একদিন ধূলিসাৎ হবে—ঠাকুরের মুসলমান ধর্ম সাধন কি তারই সূচনা?

এদিকে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মথুরবাবু স্থির করলেন তাঁর পক্ষে একবার জন্মভূমি কামারপুকুর ঘুরে আসাই ভাল হবে। মথুরামোহনের পত্নী রাসমণি-কন্যা ভক্তিমতী জগদম্বা জানতেন

কামারপুকুরে ঠাকুরের সংসার শিবের সংসার—সেখানে চির-দারিদ্র্য। যাতে ওখানে কোন জিনিসের অভাবে ঠাকুরের কষ্ট না হয়, এইভাবে তিনি সযত্নে সব জিনিস গুছিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রাদেবী থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দীর্ঘকাল পরে তাকে পেয়ে কামারপুকুরের দরিদ্র সংসারে আনন্দের হাট বসল। ঠাকুরের পত্নী সারদামণি এলেন কামারপুকুরে তাঁর সেবা করতে। পত্নী সর্বতোভাবে তাঁরই মুখাপেক্ষী— তাকে দীক্ষা দিলেন। শিক্ষা দিলেন যাতে তিনি দেবতা, গুরু ও অতিথির সেবায় কল্যাণময়ী হয়ে উঠতে পারেন।

প্রায় সাতমাস কামারপুকুরে কাটিয়ে ১২৭৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

এরপর চারমাস কাটল তীর্থে তীর্থে; এই তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন মথুরামোহন। দেওঘর—কাশী—প্রয়াগ—বৃন্দাবন তারপর আবার দক্ষিণেশ্বরে।

চৌদ্দ বছর ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থেকে মথুরামোহনের মন এখন সম্পূর্ণ নিষ্কাম। একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুর মথুরকে বলেছিলেন— মথুর, তুমি যতদিন থাকবে আমি ততদিন এখানে থাকব। ঠাকুরের কথা শুনে মথুর আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তিনি বললেন—সেকি বাবা, আমার পত্নী আর পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে কত ভক্তি করে।

মথুরের কাতরতা দেখে ঠাকুর বললেন—আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দ্বারকানাথ যতদিন থাকবে আমিও ততদিন থাকব।

এই উক্তি সত্য হয়েছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে; এরপর মাত্র তিন বছর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন।

পাঁচ

মথুরামোহন দেহত্যাগ করলেন ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে।

চৌদ্দ বছর বয়সে শ্রীসারদামা'র প্রথমবার স্বামীদর্শন হয়েছিল কামারপুকুরে। ঐ বালিকাবয়সে তিনি ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ যত্নলাভে আনন্দে পূর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদের কাছে বলতেন—'আমার মনে হতো যেন হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে—সেই স্থির, অক্ষয় ও দিব্য উল্লাসে অন্তর যে কিভাবে পূর্ণ থাকত তা ব'লে বোঝাতে পারি না।'

কয়েকমাস পরে ঠাকুর ফিরে গেলেন কলকাতায়। শ্রীসারদা মা-ও চলে গেলেন পিত্রালয়ে। কিন্তু এই সময় থেকেই কি এক গভীর উপলব্ধিতে তাঁর চলনে-বলনে-আচরণে একটা পরিবর্তন দেখা গেল! চপলতার পরিবর্তে শান্তস্বভাব, প্রগল্‌ভতার পরিবর্তে চিন্তাশীলতা, স্বার্থদৃষ্টির স্থলে উদারতা—যেন করুণার এক সাক্ষাৎ প্রতিমা। ঠাকুরকে দেখবেন, তাঁর সেবা করবেন এই কামনায় তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যেতে ইচ্ছে হতো—কিন্তু তিনি সযত্নে মন সংযত ক'রে রাখতেন; ভাবতেন, তিনি সময় হলেই নিজের কাছে ডেকে নেবেন।

ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল—একে একে দীর্ঘ চার বছর।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমা—সেদিন গঙ্গাস্নানের জন্য বাংলার সুদূর প্রান্ত থেকে কত লোক কলকাতায় আসে। তিনি গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা পিতার কাছে প্রকাশ করলেন। পিতা বুঝতে পারলেন, কন্যা কেন কলকাতায় যেতে চান—তিনি নিজেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন স্থির করলেন।

তখন রেলপথ হয় নি, জলপথেও যাবার ব্যবস্থা ছিল না। পিতা কন্যাকে নিয়ে পদব্রজেই যাত্রা করলেন। সঙ্গে অন্যযাত্রীরাও ছিলেন।

পথে ধানক্ষেতের পর ধানক্ষেত—এখানে ওখানে পদ্মেভরা দীঘি। অশ্বত্থ-বটের শীতল ছায়ারও অভাব ছিল না।

প্রথম দু-তিনদিন ভালভাবেই কাটল। কিন্তু পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। পিতা তাঁকে নিয়ে চটিতে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু পরদিন সকালেই জ্বর ছেড়ে গেল—আবার শুরু হলো পথচলা। কিছুদূর যেতেই একটি শিবিকা পাওয়া গেল।

ক্রমে পথ শেষ হলো। রাত ন-টায় শ্রীসারদা মা দক্ষিণেশ্বরে এলেন ঠাকুরের কাছে। অসুস্থ অবস্থায় তাকে আসতে দেখে ঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বাড়তে পারে, এই আশঙ্কায় নিজের গৃহেই ভিন্ন শয্যায় তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করে দিলেন, আর বার-বার বলতে লাগলেন—আর কি মথুরবাবু আছেন যে তোমার যত্ন হবে?

ঔষধ, পথ্য ও সেবার গুণে তিন-চার দিনের মধ্যে শ্রীসারদা মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তখন ঠাকুর নহবতঘরে নিজের মা'র কাছে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পিতা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন জয়রামবাটীতে।

সুস্থ হয়ে অসীম আনন্দ ও উৎসাহে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন দেবতার ও দেবজননীর সেবায়।

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে শ্রীসারদা মা প্রশ্ন করেছিলেন— আমাকে তোমার কি মনে হয়? ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন—যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন নহবতে বাস করছেন আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি আমার কাছে সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে ঠাকুর ষোড়শী পূজা সমাপ্ত করলেন। সেদিন অমাবস্যা, কালিকাপূজার পুণ্যদিন।

ষোড়শী পূজার পরে প্রায় পাঁচমাস শ্রীসারদা মা ঠাকুরের কাছে ছিলেন, এরপর ফিরে গিয়েছিলেন কামারপুকুরে।

ছয়

সাধারণভাবে বলতে গেলে ষোড়শী পূজানুষ্ঠানের পরই ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এর একবছর পরে 'ঈশা-প্রবর্তিত ধর্মে, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মে অদ্ভুত উপায়ে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সাধনার শেষে তাঁর কয়েকটি বিশেষ উপলব্ধি হয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি ঈশ্বরের অবতার—তাঁর সাধনভজন অন্যের জন্য, জীবের কল্যাণ-সাধনই এর লক্ষ্য, ব্যক্তিগত অভাবমোচন নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মুক্তি নেই। জীবের কল্যাণ-সাধন ব্রত যতদিন থাকবে ততদিন যুগে-যুগে তাঁকে আবির্ভূত হয়ে ঐ কর্মভার গ্রহণ করতে হবে।

এই কারণে ঠাকুরের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। ভক্তদের দেখবার জন্য, তাদের অন্তরে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ঈশ্বরের কথা তাদের কাছে বলে প্রাণ শীতল করবেন—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা তাদের কাছে বলে হৃদয়ের বোঝা লঘু করবেন।

শ্রীসারদা মা দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে এলেন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে; আগের মতোই তিনি নহবতঘরে ঠাকুরের জননীর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে মথুরবাবু লোকান্তরিত হবার পর তাঁর পদে এলেন শম্ভুচরণ মল্লিক। তিনি ঠাকুরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। শম্ভুবাবু দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছেই একটি চালাঘর নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ঘরে শ্রীসারদা মা প্রায় একবছর বাস করেছিলেন। তিনি এই ঘরে রোজ নানারকম খাবার রান্না করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যেতেন এবং ঠাকুরের খাওয়া শেষ হলে ফিরে আসতেন।

তাঁর খোঁজ-খবর নেবার জন্য ঠাকুরও দিনের বেলা শ্রীসারদা মার ঘরে আসতেন এবং কিছুটা সময় তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে মন্দিরে ফিরে যেতেন।

একদিন শুধু এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল।

সেদিন ঠাকুর শ্রীসারদা মার কাছে আসার পরই এমন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল যে মন্দিরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সে রাত্রি তিনি সেখানেই কাটিয়েছিলেন—শ্রীসারদা মা তাঁকে ঝোল-ভাত রেঁধে খাইয়েছিলেন।

একবছর এই ঘরে থাকার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একটু ভাল হয়ে তিনি চলে গেলেন জয়রামবাটীতে—তাঁর পিতা তখন পরলোকগত।

এদিকে ঠাকুরের জননী চন্দ্রাদেবী ৮৫ বছর বয়সে, ১২৮২ সালে দেহত্যাগ করলেন।

ঠাকুরের জীবনে মাতৃ-বিয়োগের এক বছর আগেকার একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১২৮১ সালের চৈত্রমাসে তাঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ায় বাগান বাড়িতে সাধন-ভজনে আছেন জানতে পেরে তিনি হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তখন কেশবচন্দ্রকে ঘিরে তাঁর অনুচরবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুর তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন—তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করে থাক; সে দর্শন কেমন তা জানতে বড় ইচ্ছে। তাই এলাম।

ঠাকুরের পরনে সেদিন একখানি লালপেড়ে কাপড়—কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ঝোলান।

ঠাকুরকে দেখার জন্য ওঁরা সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন—এইবার দেখে বুঝতে পারলেন—ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর 'কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে পায় না রে'—রামপ্রসাদের এই গানটি গাইতে গাইতে সেদিন সমাধিস্থ হয়েছিলেন, লেন।

তারপর অর্ধচৈতন্য অবস্থায় ঠাকুর গভীর অধ্যাত্ম-বিষয়গুলি সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে এমন সরলভাবে বোঝাতে লাগলেন যে সবাই মুগ্ধ হলেন। স্নানাহারের সময় পার হয়ে আবার যে উপাসনার সময় উপস্থিত হয়েছে সে কথা কারও মনে এল না।

ওঁদের ঐরকম ভাব দেখে ঠাকুর বলেছিলেন—'গরুর পালে অন্য পশু এলে তারা তাকে গুঁতোতে যায়, কিন্তু অন্য গরু যদি আসে তবে তার গা চাটাচাটি করে; আমাদের অবস্থাটাও আজ সেই রকম।'

পরে ঠাকুর কেশবকে বললেন—'তোমার আজ ল্যাজ খসেছে!'

কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে কেশবের দল যখন একটু অসন্তোষের ভাব দেখাল তখন ঠাকুর বুঝিয়ে বললেন—'দেখ ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে—স্থলে উঠতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ খসে পড়লে জলেও থাকতে পারে, ড্যাঙাতেও বিচরণ করতে পারে। সেইরকম, মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে কেবল সংসার জলেই থাকতে পারে; ল্যাজ খসে গেল সংসার আর সচ্চিদানন্দ দুটোতেই বিচরণ করতে পারে।'

এই ঘটনার পর থেকে কেশবচন্দ্র প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগলেন; এমনকি তাঁর কলকাতার 'কমলকুটির' নামক আবাসেও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে তাঁর দিব্য সঙ্গ লাভ করতেন। দু-জনের মধ্যে সম্পর্ক এমন গভীর হয়ে উঠেছিল যে একে অন্যকে কয়েকদিন না দেখতে পেলে দু-জনেই বিশেষ অভাব বোধ করতেন।

কেশবচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরে যেতেন তখন তিনি রিক্ত হয়ে যেতেন না—কিছু ফলমূল তার সঙ্গে থাকত। সেই ফলমূল তিনি ঠাকুরের সামনে রেখে শিষ্যের মতো তাঁর কাছে কথাবার্তা বলতেন।

ঠাকুর রহস্য করে একদিন তাঁকে বলেছিলেন—কেশব, তুমি তো এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর—আমাকে কিছু বল?

কেশব বিনীতকণ্ঠে বললেন—'আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচতে যাব? আপনি বলুন, আমি শুনি।'

কেশবচন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কত গভীর ছিল তা তাঁরই একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করলেন; সংবাদ পেয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমি তিন দিন শয্যাত্যাগ করতে পারি নি, মনে হয়েছিল যেন আমার একটা অঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে গেছে।'

সাত

ঠাকুরকে দেখলেই মনে হতো যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্তি—যেখানে সকল ধর্মীয়ভাব একত্র ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে দেহটারও যেন পরিবর্তন ঘটত।

নির্বিকল্প সমাধিতে 'আমি' জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন সব বন্ধ! 'সখীভাব সাধনে' নিজেকে কৃষ্ণের দাসী বলে ভাবতে-ভাবতে মন তন্ময় হয়ে গেল—অমনি দেহে এলো স্ত্রী-সুলভ ভাব, চলনে বলনে, প্রত্যেকটি কাজে।

সবচেয়ে বড় বিস্ময় ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণের ক্ষমতা। বালক, যুবা, বৃদ্ধা, বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী-পুরুষ সকলের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে কার কি ব্যবস্থা প্রয়োজন তা করে দেওয়া। তিনি বলতেন—'লোকের দিকে চেয়েই কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল, কে মন্দ, কার হবে, কার হবে না—সব জানতে পারি।'

ঠাকুর ভাবমুখে থাকতেন বলেই তিনি সকল অনুভবের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ভাবমুখে থাকার অর্থ কি? যা-থেকে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে সেই বিরাট 'আমি'ই যে 'আমি'—এই ভাবটি সর্বদা অনুভব করা। মনে সকল সময় এইটি অনুভব করা যে আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ছোট আমি'র সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ঠাকুরের গুরুদেব নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরী নিজের গুরুর কাছেই বেদান্তে উপদেশ পেয়েছিলেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছেন—'জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয়—এই তিন বস্তু একত্র লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ, ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন তা সম্ভব হয় না।' তোতাপুরী যে ভাগ্যক্রমে ঐ তিনটি শুধু একসঙ্গে পেয়েছিলেন তা নয়—ঐ সকলের ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর তিনি পূর্ণতর করে গেলেন রামকৃষ্ণের সাধনাকে—তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধনাকে।

অবিশ্বাসীর দল আসেন, যাঁরা ঈশ্বরবিমুখ তাঁরাও আসেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায়ই যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—ঠাকুরের ভাবসমাধি মস্তিষ্কের বিকারমাত্র। ঠাকুর বলেছিলেন—তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকা—এই সব জড় বস্তুতে মন রেখে ঠিক থাকবে আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় তাঁর কথা ভেবে আমি বুঝি অচৈতন্য হলাম? এ কিরকম বিচার?

শিবনাথ নির্বাক, নতশির হয়ে রইলেন।

কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব, বৈরাগ্যবান্ মানুষ কই—তাদের তো দেখা নেই।

ঠাকুর বলতেন, ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনিই এসে জুটে, তাকে ডেকে আনতে হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এসে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কলকাতার সিমলা-অঞ্চলনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি একদিন ঠাকুরকে নিয়ে আসেন সিমলায়, নিজের গৃহে।

একটু আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়াতে প্রতিবেশী এ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথকেও

আমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে ভজন গেয়ে শোনাবেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভজন গানের শেষে একবার দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানালেন।

কিছুদিন পরে একদিন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে পরে একদিন ঠাকুর বলেছিলেন—পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলাম, নিজের দেহের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনো পরিপাট্য নেই। চোখ দেখে আকৃষ্ট হলাম। ভাবলাম, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতা, এখানে এই সত্ত্বগুণের আধার থাকাও সম্ভব?

মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললাম। সঙ্গে দু-চারজন বন্ধুও ছিল, তবে তাদের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত, বিষয়ী লোকের যেমন হয়। গান গাইতে বলায় সে গাইল—'মন চল নিজ নিকেতনে।' এত তন্ময় হয়ে সে গানটি গাইতে লাগল; আমি শুনতে-শুনতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

পরে সে চলে গেল। কিন্তু তাকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ সারা দিনরাত এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলে বোঝাতে পারি না। কাঁদতে কাঁদতে বলতাম—'তুই ফিরে আয়, তোকে না দেখে থাকতে পারছি না।' আরও কত ছেলে এখানে এসেছে কিন্তু কারও জন্য এমন হয় নি।

নরেন্দ্রনাথ পরে কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছিলেন—'গানের পরে ঠাকুর আমার হাত ধরে ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত কিছু উপদেশ দেবেন। কিন্তু চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখে জলের ধারা! তিনি পরম স্নেহে বলতে লাগলেন—'এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর প্রতীক্ষা করে আছি। সে কথা কি ভাবতে নেই?' পরে ঘর থেকে মাখন, মিশ্রী আর সন্দেশ নিয়ে এসে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন।

সব খাইয়ে দিয়ে তবে নিরস্ত হলেন। পরে বললেন—'খুব শীগ্‌গিরই একদিন এসো, তুমি একা।' আমি বললাম—'আসব।'

মাত্র আঠারো বছরের তরুণ নরেন্দ্রনাথ। ছাত্রজীবন চলছে, মাত্র এফ. এ পরীক্ষা দিয়েছেন। বিশেষ নিষ্ঠা সঙ্গীত শিক্ষায়।

তাঁর জীবনের আর একটি প্রবল প্রেরণা—ধর্মজিজ্ঞাসা। ঈশ্বর আছেন কিনা এবং তাঁকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ পথ কি—? এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল। শেষে ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যয়নে নরেন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বলিষ্ঠ দেহ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা নিয়েই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এছাড়া ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষাতেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল ; মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সমান উৎকর্ষ ছিল তাঁর আদর্শ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর প্রায় মাস খানেক কেটে গেছে।

এবার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। পদব্রজে যাত্রা করলেন একা নরেন্দ্রনাথ।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে একেবারে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। শয্যার পাশে ছোট একটি তক্তপোশে বসে আছেন ঠাকুর—ঘরে অন্য কেউ নেই। তাকে দেখেই ঠাকুর আনন্দে ছুটে এলেন কাছে—তারপর এক প্রান্তে বসালেন নরেন্দ্রনাথকে।

নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন ঠাকুর। নরেন্দ্রনাথের দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছেন তিনি। কাছে এসে সহসা ঠাকুর তার দক্ষিণপদ নরেন্দ্রনাথের অঙ্গে স্থাপন করলেন—পদস্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুত উপলব্ধি জাগল নরেন্দ্রনাথের। তিনি চেয়ে দেখলেন ঘরের দেয়ালের সঙ্গে ঘরের সমস্ত জিনিষ প্রচণ্ড

বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় যেন লীন হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো, তাঁর 'আমিত্ব' যেন সর্বগ্রাসী শূন্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তিনি ভাবলেন, আমিত্বের নাশেই তো মরণ! আতঙ্কে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!

ঠাকুর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন—বললেন, তবে এখন থাক, কালে হবে।

আশ্চর্য। বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ যেন মুছে গেল—সবই অবার যথাস্থিত বলে মনে হতে লাগল।

ঘটনাটি ঘটল—খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। নরেন্দ্রনাথের মনে এক বিপ্লব সৃষ্টি হলো—এটা কি? কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো মীমাংসা খুঁজে পেলেন না নরেন্দ্রনাথ। তিনি ডুবে গেলেন নানা বিরোধী চিন্তার আবর্তে। কিন্তু ঠাকুরকে মনে হলো অন্য মানুষ। প্রথমবারের মতোই আদর ক'রে খাওয়ালেন, আত্মীয়ের মতো কথাবার্তা বললেন। বেলা শেষ হয়ে এলো দেখে নরেন্দ্রনাথ সেদিনকার মতো বিদায় প্রার্থনা করলেন।

ঠাকুর আবদার করলেন—আবার শীঘ্র আসবে বল। নরেন্দ্রনাথ কথা দিলেন—আসবেন।

সপ্তাহকালের মধ্যেই আবার তাকে যেতে হলো দক্ষিণেশ্বরে। দ্বিতীয়বারের অভিজ্ঞতার পরে তাঁর নিশ্চয়ই কৌতূহল জেগেছিল ঠাকুরকে জানবার জন্য; তবে এবার তিনি গেলেন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে যাতে আগের মতো কোন ভাবান্তর না হয়।

ঠাকুর সেদিন নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন যদুলাল মল্লিকের বাড়ির উদ্যানে। যদুলাল ও তার মা—দুজনেই ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত। উদ্যানের প্রধান কর্মচারীর উপর তাঁদের আদেশ ছিল যে তাঁরা উপস্থিত না থাকলেও—ঠাকুর এলেই যেন গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘরটি খুলে দেওয়া হয়।

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছুক্ষণ উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ালেন—তারপর এসে বসলেন বৈঠকখানায়।

কিন্তু এই ঘরে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর সেই অবস্থাতেই সহসা এসে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করলেন। সতর্ক থাকা সত্বেও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

যখন চৈতন্য ফিরে এল তখন দেখলেন ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন—তাঁব মুখে মৃদু মধুব হাসি।

নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে ঠাকুর বলেছিলেন—সেদিন ওর সংজ্ঞালোপের পবে আমি ওকে কতকগুলো প্রশ্ন করেছিলাম, সে কে, কোথা থেকে এসেছে এই পৃথিবীতে, কেন এসেছে এই সব। সে-ও যথাযথ উত্তর দিয়েছিল।

যাইহোক, ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়েও নবেন্দ্রনাথের যুক্তিবিলাসী মন তাঁকে ঠিক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারছিল না, প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেও তিনি যেন দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন। উচ্চ আধার ছিলেন বলেই তিনি এই দু-দিনের ঘটনায় আত্মহারা হন নি। কিন্তু বশ্যতা না মানলেও ঠাকুরেব প্রতি আকর্ষণ তিনি তুচ্ছ করতে পাবেন নি!

এদিকে প্রথম সাক্ষাতের পব থেকে ঠাকুরও নবেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—গুরু সুযোগ্য শিষ্য পেয়ে তার অন্তরে নিজের জীবন সম্পদ ঢেলে দেওয়ার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে ভালবেসেছিলেন পরমাত্মীয়ের মতো—এ ভালবাসা অহেতুক; নরেন্দ্রনাথের বিরহে ব্যাকুলতা, দর্শনে উল্লাস, মাত্র কয়েক দিনের অদর্শনেই দারুণ উৎকণ্ঠা। তিনি বলতেন 'নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্ব-

গুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ—তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'

দীর্ঘ পাঁচ বছর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। সপ্তাহে দু-একদিন আর অবসর পেলে চারদিন পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে আসতেন। প্রথম দু-বছর এই যাতায়াত ছিল নিয়মিত—কিন্তু ব্যতিক্রম হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর।

সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথের বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে, সহসা পিতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের সমস্ত ভার পড়ল নরেন্দ্রনাথের উপরে। তখন নানাকারণেই আগের মতো দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতেন না। তবে এই সময়ের মধ্যেই পরস্পরের বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে গুরু শিষ্যকে শিক্ষাদান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আশ্রিতদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কিনা তা জানবার জন্য তিনি বিরলে অথবা কয়েকজন ভক্তের সামনেই তাঁকে অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসতেন। অনেক সময়ে বলতেন—আচ্ছা আমাকে দেখে তোর কি মনে হয়? এই একটি প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর! কেউ বলত, আপনি 'যথার্থ সাধু', কেউ বলত 'ঈশ্বরভক্ত', কেউ 'মহাপুরুষ', কেউ 'সিদ্ধপুরুষ', কেউ 'ঈশ্বরাবতার', কেউ বলত 'আপনি স্বয়ং ভগবান'। ঐ সব উত্তরের আলোকে ঠাকুর 'যার যেমন ভাব' তাকে সেই ভাবেই উপদেশ দিতেন। কারও ভাব নষ্ট করতেন না।

একবার ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করেছিলেন অন্যভাবে। নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। হঠাৎ একদিন তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্র এলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, কিছুক্ষণ সামনে বসে রইলেন—ঠাকুর আদর-যত্ন করা দূরে থাক, কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না। কিছুক্ষণ পরে আবার এলেন, ঠাকুর শুয়ে ছিলেন—তাঁকে দেখে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। সারাদিন এইভাবে গেল, সন্ধ্যাতেও কোন ভাবান্তর

না দেখে নরেন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

সপ্তাহ পরে আবার এলেন নরেন্দ্রনাথ কিন্তু ঠাকুরের ঐ একই রূপ। এইভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনেও কোন ভাবান্তর দেখতে পেলেন না নরেন্দ্রনাথ। তবু বিচলিত না হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগলেন। মাসখানেক গেলে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন—আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটি কথাও বলি না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস্ বল্‌তো? নরেন্দ্রনাথ বললেন—'আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে তাই আসি।'

ঠাকুর খুশী হয়ে বললেন—আসলে, আমি তোকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম, আদর-যত্ন না পেলে তুই পালাস্ কিনা। তোর মতো আধারই এই অনাদর সহ্য করতে পারে, অন্যে হলে কোন্ কালে পালিয়ে যেত, এদিক আর মাড়াত না।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথের সংসারে তখন ভীষণ দুর্দিন। অনাহারে নগ্নপদে চাকুরির আবেদন পত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে কিন্তু সর্বত্র বিফলতা। সামান্য আহারে বা অনশনেই দিন কাটতে লাগল।

দুঃখ যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন একদিন তাঁর উপলব্ধি হোল সাধারণের ন্যায় অর্থ উপার্জন করে সংসারসেবার জন্য তার জন্ম হয় নি—তিনি সংসার ত্যাগ করবেন।

মনের সঙ্কল্প যখন এইভাবে দৃঢ় হয়ে উঠছে তখন একদিন সংবাদ পেলেন কলকাতায় এক ভক্তের গৃহে ঠাকুর আসছেন। ভাবলেন, 'ভালই হলো, গুরুদর্শন করেই চিরকালের মতো গৃহত্যাগ করব।'

কিন্তু দেখা করতেই গুরুদেব বললেন—তোকে আজ আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে। কিছুতেই ছাড়লেন না, তাঁর সঙ্গে যেতে হলো।

দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিতে নরেন্দ্রকে কাছে ডেকে নিয়ে ঠাকুর বললেন—

আমি জানি, তুই এসেছিস্ মায়ের কাজে, সংসারে তুই থাকতে পারবি না; কিন্তু আমি যতদিন আছি, ততদিন তুই আমার জন্য থাক্।

ঠাকুর নিশ্চয়ই সব কথা জানতে পেরেছেন! তার চক্ষে জলের ধারা—নরেন্দ্রনাথও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসে আবার উপার্জনের চেষ্টা! অ্যাটর্নি অফিসে পরিশ্রম ক'রে, কিন্তু পুস্তকের অনুবাদে সামান্য উপার্জন হতো—তাতে কোনমতে দিন কাটতে লাগল। কিন্তু স্থায়ী কোন কাজ জুটল না।

হঠাৎ একদিন কি একটা কথা মনে পড়ায় তিনি ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুবের কাছে বললেন—মা তো আপনার কথা শোনেন, আপনি তাঁকে বলুন, আমাদের সংসারের দুঃখ দূর করতে।

ঠাকুর বললেন—ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন? মাকে মানিস না বলেই তো তোর এত কষ্ট!

নরেন্দ্রনাথ বললেন—আমি তো মাকে জানি না, আপনি আমাব জন্য মাকে বলুন, আপনাকে বলতেই হবে। ঠাকুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি তো কতবার বলেছি, কিন্তু তুই যে মাকে মানিস না—তাই তো মা শুনতে চান না! আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি তোকে বলছি, আজ রাত্রে কালীমন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম কবে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।

নরেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস হলো। ঠাকুর যখন বলেচেন তখন মা'ব কাছে প্রার্থনা করলেই সব দুঃখের অবসান হবে।

প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির জন্য আকুল প্রতীক্ষা!

রাত্রি এক প্রহর পার হবার পর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন মন্দিরে যেতে।

নরেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে ভাবছেন, তিনি মাকে দেখবেন তার কথা শুনবেন! মন্দিরে যেতে যেতে কি একটা গাঢ় নেশায় তিনি যেন

সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। মন্দিরে ঢুকেই তিনি দেখলেন—মা সত্যই অনন্ত প্রেমে চিন্ময়ী ও সৌন্দর্যরূপিণী। ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়ে বার-বার প্রণাম করতে-করতে তিনি বলে উঠলেন—'মা, আমার বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও,—যাতে নিত্য দর্শন লাভ করতে পারি।'

ঠাকুরের কাছে ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর বললেন—'কিরে, মার কাছে তোর সংসারের অভাব দূর করবার কথা বলেছিস তো?'

প্রশ্নে চকিত হয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাইতো, সব ভুলে গেছি, এখন কি করি?'

ঠাকুর বললেন, 'যা, যা, ফিরে গিয়ে মাকে সব কথা জানিয়ে আয়!'

আবার মন্দিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ। মাকে প্রণাম করে আবার সেই প্রার্থনা—'মা! আমায় বিবেক দাও, জ্ঞান দাও, বৈরাগ্য দাও—'

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের মুখে স্নিগ্ধ হাসি! '—কি রে, সব ঠিক ঠিক বলেছিস্ তো?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'না, বলতে পারি নি। মাকে দেখার পর কি একটা দৈবশক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল যে শুধু জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ছাড়া—'

ঠাকুর বললেন, 'একটু সামলে নিয়ে নিজের কথাটা তো বলতে হয়। পারিস তো আবার গিয়ে মাকে সব কথা জানিয়ে আয়।'

কিন্তু তৃতীয় বারে এক দারুণ লজ্জা এসে তাঁকে বাধা দিল। তাঁর মনে হলো—ছি, ছি, এত তুচ্ছ কথা মাকে বলতে এসেছেন তিনি? যাঁর প্রসাদ পেয়ে তিনি ধন্য, তাঁর কাছে অর্থভিক্ষা? অনুতাপে, আক্ষেপে তিনি বার-বার প্রণাম করে বলতে লাগলেন—'তুমি আমায় শুধু জ্ঞান আর ভক্তি দাও, আমি আর অন্য কিছুই চাই না।'

ঠাকুর সব কথা শুনে হেসে বললেন, 'তোর কপালে সংসার সুখ নেই তা আমি কি করব ?'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনিই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন নইলে আমি চাইতে পারলাম না কেন ? এখন আপনিই বলুন মার কাছে !'

ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা, আজ থেকে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কখনও হবে না।'

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ।

একদিন ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত। নানা বিষয় কথাবার্তা চলছে; কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠল। ঠাকুর ঐ ধর্মের মূলতত্ত্ব সকলকে অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'ঐ ধর্ম উপদেশ দিচ্ছে তিনটি বিষয় পালন করতে—নামে রুচি, জীবে দয়া আর বৈষ্ণব-পূজন। যে নাম সেই ঈশ্বর অর্থাৎ নাম-নামীতে অভেদ জেনে ভক্তির সঙ্গে নাম উচ্চারণ করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে বৈষ্ণব-বন্দনা করবে। আর কৃষ্ণেরই জগৎ এই জেনে 'সর্বজীবে দয়া—'

এই পর্যন্ত বলেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অর্ধচৈতন্য অবস্থাতেই বলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া ? দূর শালা ! কীটাণুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না-না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !'

সেদিন ভাব-ভঙ্গের পরে নরেন্দ্রনাথ বাইরে এসে বললেন, 'ঠাকুরের কথায় এক নূতন আলোর সন্ধান পেলাম। বেদান্ত জ্ঞানকে কি সুন্দরভাবে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে ! আজ উনি বুঝিয়ে দিলেন বনের বেদান্তকেও ঘরে আনা যায়। শুধু এই বিশ্বাসটুকু চাই—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে সামনে প্রকাশিত। জীবের সেবাই ঈশ্বর পূজা !'

গুরুদেবের 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ে'র আশীর্বাদে শিষ্যের সংসারে সচ্ছলতা না এলেও তেমন সঙ্কটের অবস্থা আর ছিল না। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিন চার মাস পরেই সে-কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ; কারণ সেই সময়ে ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

পীড়া গুরুতর—কণ্ঠনালীতে ঘা। এক মাসের মধ্যেও ব্যথার উপশম হলো না। নরেন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত থেকে সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দেখা গেল, বেশি কথা বললে বা সমাধিস্থ হলে ব্যথা বেড়ে যায়। এইবার অসুস্থ গুরুদেবকে কেন্দ্র করেই রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর মধ্যে গড়ে ওঠে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। এই বন্ধন থেকে উত্তর-কালে হয়েছিল রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সূচনা।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে পানিহাটিতে বৈষ্ণবীয় উৎসব। ঠাকুর আগে অনেকবার সেই উৎসবে গিয়েছেন, স্থির করেছেন ভক্তবৃন্দকে নিয়ে এবারেও যাবেন।

অজস্র লোকের মেলা—কীর্তনে, কলরবে মুখরিত। নরেন্দ্রনাথ বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সবার সজাগ দৃষ্টি রইল ঠাকুর যাতে কীর্তনে মাতামাতি না করেন।

কিন্তু কীর্তনের আসরে ঠাকুরকে রুখবে কে? তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করতে-করতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। তারপর অর্ধচৈতন্য দশাতে আবার নৃত্য করতে লাগলেন। সেই আত্মহারা তাণ্ডব নৃত্যে কি যে রুদ্র-মধুর মাধুর্য, তা না দেখলে বুঝানো কঠিন। ভাবাবিষ্ট দেহের সে কি দিব্য দীপ্তি!

এদিকে উৎসবের হুল্লোড় থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের ব্যথা আরও বেড়ে গেল। তিনিই যে নিজের আগ্রহে সবাইকে নিয়ে উৎসবে গিয়েছিলেন সে-কথা ভুলে গিয়ে শিশু-স্বভাব ঠাকুর সব দোষ চাপিয়ে দিলেন প্রবীণ ভক্তদের ঘাড়ে। তিনি বললেন, 'ওরা যদি আমাকে একটু জোর করে নিষেধ করত তবে কি আমি যেতে পারতাম? আর

একজন ভক্তের কাছেও এই বলে আক্ষেপ করলেন, 'এই ছাখ দেখি—উপরে জল, নিচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা আর রাম (রামচন্দ্র) কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এল।'

মাসাধিক চিকিৎসার পরেও ঠাকুরের গলা-ব্যথার উপশম হলো না। ঔষধ-পথ্যের নিয়ম মেনে চললেন, কথা না-বলার নিয়ম তিনি মানতে পারলেন না। কেউ কাছে গেলে তিনি আগের মতোই আত্মহারা হয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন।

এদিকে ধর্মপিপাসুদের সংখ্যা দিনেদিনে বাড়ছে। একদিন শোনা গেল, তিনি জগন্মাতার কাছে আক্ষেপ জানাচ্ছেন, 'এত লোক কি আনতে হয়? লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। (নিজের দেহ লক্ষ্য করে) একটা তো এই ফুটো ঢাক, রাতদিন এটাকে বাজালে আর ক'দিন টিকবে?'

ক্রমে বিষাদের অন্ধকার নেমে এল দক্ষিণেশ্বরে। আরোগ্যের কোন লক্ষণ নেই, বরং রোগ এখন বৃদ্ধির পথে।

একদিন কণ্ঠ দিয়ে রক্তপাত হলো। ভক্তদল স্থির করলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরকে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করাতে হবে।

ঠাকুর সম্মত হলেন; তাঁকে আনা হলো কলকাতায়। কিন্তু তিনি কলকাতায় এসেছেন এ-সংবাদ রাষ্ট্র হবার সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ভক্তজন আসতে লাগল তাঁকে দেখতে। ঠাকুরও উৎসাহিত হয়ে তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় মত্ত হলেন। এতে কোন বিশ্রাম ছিল না।

তিনি তখন ছিলেন বলরাম বসুর গৃহে। তারপরে এলেন শ্যামপুকুর স্ট্রীটে। এখানে গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুরের থাকবার ব্যবস্থা করা হলো।

যোগ্যমতো পথ্য প্রস্তুত করবার দায়িত্ব নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে

এলেন শ্রীসারদা মা। রাত্রিতে সেবার দায়িত্ব নিলেন নরেন্দ্রনাথ।

তবু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেল না। দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা অতিক্রান্ত হলো—ব্যাধির উগ্রতা বাড়ল, দর্শনার্থীর সংখ্যাও বাড়ল।

দর্শনার্থীদের মধ্যে পরিচিত, অর্ধপরিচিত এবং সম্পূর্ণ নবাগতও আছেন। কে কবে ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে জীবনের সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছিল, ঐ স্পর্শমণির ছোঁয়ায় কার প্রাণ কবে সোনায় পরিণত হয়েছিল—সেও ছুটে এসেছে তার পরিত্রাতাকে দেখতে। তাব অন্তরের ব্যাকুলতা কোন নিয়মের বাধাই মানতে চায় নি!

এদিকে রোগ বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ম হয়ে গেছে—ঠাকুর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোন নূতন লোক এসে যেন তাঁকে চরণ স্পর্শ করে প্রণাম না করে। পাপীর স্পর্শে ঠাকুরের কণ্ঠক্ষত হয়েছে কিনা কে বলতে পারে!

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, এভাবে নূতন লোকের আসা বন্ধ করা যাবে না, পাপীর উদ্ধারের জন্যই উনি দেহ ধারণ করেছেন।

অনেকদিন আগেকার কথা। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। অফিসঘরে এসে খোঁজ করেছিলেন, চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছে কোন্ ছেলেটি?

ছেলে নয়, মেয়ে। নত মুখে নটী বিনোদিনী এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলে ঠাকুর উচ্ছ্বসিত হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোর চৈতন্য হোক'।

এই দিব্য আশীর্বাদে চৈতন্য হয়েছিল মেয়েটির। পাপের পঙ্কিল অন্ধকার থেকে আলোকের পথে পা বাড়াবার সে এক করুণ ইতিহাস! লোকচক্ষুর আড়াল থেকেই নিভৃতে সে এতকাল

ঠাকুরকে পূজা করেছে। আজ রোগশয্যায় সে তাঁকে দেখতে পাবে না?

গিরিশচন্দ্রের অনুগামী কালিপদ ঘোষের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে তার শরণাপন্ন হল।

পুরুষের বেশে 'হ্যাট-কোটে' সজ্জিত হয়ে এসেছে বিনোদিনী। প্রবীণ ভক্তদের কাছে কালিপদ পরিচয় দিয়েছে নিজের বন্ধু বলে, কেউ বাধা দেয় নি।

ঠাকুরের ঘরে কেউ ছিল না। কালিপদ ঠাকুরের কাছে বিনোদিনীর পরিচয় দিল।

রঙ্গপ্রিয় ঠাকুরের মুখে মধুর হাসি। তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে তিনি প্রসন্ন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'ভালো আছ তো?'

বিনোদিনী চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে ঠাকুরের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

ঠাকুর তাকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। তারপর কালিপদের সঙ্গে ধীরপদে চলে গেল নটী বিনোদিনী।

আট

এরপর শ্যামপুকুরের আশ্রয় ছেড়ে কাশীপুরের বাগান বাড়ি।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি।

একদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এলেন ঠাকুরকে দেখতে। তিনি বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছে করলেই এই ব্যাধি দূর করতে পারেন।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'সেকি গো? যে মন আমি সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, সেখান থেকে তুলে এনে আবার দেহের জীর্ণ খাঁচায় ভরব!'

কিন্তু ভক্তদের এড়ান কঠিন। নরেন্দ্রনাথ আর তাঁর গুরুভাইরা চাপ দিতে লাগলেন, আপনিই আপনার এই রোগ সারাবার ভার

নিন। নিজে কিছু না করতে চান, মাকে তো বলতে পারেন।'

ঠাকুর রাজী হলেন।

মন্দির থেকে ফিরলেন ঠাকুর। শিষ্যগণ ছুটে এসেছেন। সবাই উৎসুক। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'মাকে বলেছেন? কি বললেন তিনি?'

ঠাকুর জবাব দিলেন, 'মাকে তো বললাম, গলার ক্ষতের জন্য খেতে পারি না। যাতে দু'টি খেতে পারি তাই করে দে মা। তখন মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, কেন, এই যে এত মুখে খাচ্ছিস!'

ভক্তগণ কি বলবেন? তাঁরা নীরব হয়ে রইলেন।

মহাপ্রস্থানের আগে।

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ডেকে আনলেন নিজের ঘরে। আর কেউ সে-ঘরে ছিল না।

স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথও বিহ্বল, নিস্পন্দ!

ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে এল। নরেন্দ্রনাথ দেখলেন—দুই চক্ষে জলের ধারা!

নরেন্দ্রনাথকে ধীরকণ্ঠে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলাম। সেই শক্তিতেই তুই কাজ করবি, তোর অনেক কাজ। কাজের শেষে আবার ফিরে যাবি।'

তারপর মহাপ্রস্থানের সেই লগ্ন এল।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-লীলার, ঠাকুরের মর্ত্যলীলার শেষদৃশ্য। মধ্যাহ্নের কিছু আগে যোগাসীন অবস্থায় শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন যুগাচার্য।

তৃতীয় পর্ব

কথামৃত

'ধর্ম' প্রসঙ্গে

এক

ধর্মমত ; সাধনা ; ব্যাকুলতা ; ভগবদ্দর্শন ; মায়া

যত মত তত পথ

১. মই বাঁশ সিঁড়ি দড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন বাড়ির ছাদে উঠা যায়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যাবারও অনেক উপায় আছে, প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি উপায় দেখিয়ে দিচ্ছে।

২. মা-র পাঁচটি ছেলে আছে, তিনি কাউকে চুসি, কাউকে পুতুল, কাউকে বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে আপনি নিশ্চিত হয়ে নিজের কাজ করছেন। তার মধ্যে যে-ছেলেটি খেলনা ফেলে 'মা' বলে কাঁদছে তিনি তাকেই কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করছেন। মানুষ, তুমিও অন্য জিনিস নিয়ে ভুলে আছ ; এসব ফেলে দিয়ে যখন তুমি ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে, তখনই তিনি এসে তোমাকে কোলে নেবেন।

৩. এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না, ডুব দিতে দিতে রত্ন মিলবেই মিলবে।

৪. মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারদিকে গুন্‌গুন্‌ করে ততক্ষণ সে মধু পায় নি, মধু পেলে সে আর গুন্‌গুন্‌ করে না, চুপ করে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম নিয়ে গোল করে ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায় না, পেলে চুপ করে যায়।

৫. শাস্ত্র পড়ে লোককে ঈশ্বর বোঝান আর ছবিতে কালী দেখে লোককে কালী বোঝান একই কথা।

৬. রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন—রাম আগে, তারপর সীতা, পেছনে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ রামকে দেখতে ব্যাকুল, লক্ষ্মণের প্রার্থনা মতো সীতা যেই একপাশে সরলেন অমনি তাঁর রামদর্শন হলো।

৭. সেইরকম ব্রহ্ম, মায়া ও জীব। মায়া না সরলে জীব ব্রহ্মকে দেখতে পায় না।

৮. অন্ধকার রাত্রিতে পাহারাওয়ালা লণ্ঠন হাতে চলে। সেই লণ্ঠনের আলোয় সে সবাইকে দেখতে পায়, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু লণ্ঠনটিকে যদি সে আপনার দিকে ফেরায় তবেই সকলে তাকে দেখতে পায়। ভগবানও সবাইকে দেখতে পান কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তবে যদি তিনি দয়া করে নিজেকে প্রকাশ করেন তবেই লোকে তাঁকে দেখতে পায়।

৯. চিকের ভিতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায় কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না। ভগবানও তাই।

১০. অবতার ঈশ্বরের কর্মচারী, যেমন জমিদার ও তার নায়েব। আপন অধিকারের যে-প্রদেশে গোলমাল হয় জমিদার সেইখানেই তার নায়েবকে পাঠান। তেমনি জগতের যে-কোন স্থানে ধর্মহানি হয়, সেইখানেই অবতারকে আসতে হয়।

১১. সেই একই অবতার যে ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।

১২. তোতাপুরী বলতেন, 'ঘটি রোজ না মাজলে কলঙ্ক পড়ে'।

এর অর্থ, রোজ ধ্যান না করলে মন অশুদ্ধ থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ এতে মন্তব্য করলেন, 'যদি সোনার ঘটি হয় তবে আর কলঙ্ক পড়ে না।'

১৩. সকাল বেলায় মাখন তুলতে হয়, বেলা হলে আর উঠে না।

১৪. যদু মল্লিকের বাড়ি কোথায়, তার বাগানবাড়ি কত টাকার বিষয় আছে, অনেকেই তার সন্ধান নেয়, কিন্তু যদু মল্লিকের সন্ধান ক'রে তার সঙ্গে আলাপ কেউ করে না। শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা অনেকেই আলোচনা করে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখতে চায় কয়জন?

১৫. শাস্ত্রে বলেছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। অনেকে বিনয় করে বলে, আমি কীট! কীট কীট করতে করতে বাস্তবিকই তারা কীট হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'ভরতরাজা হরিণ হরিণ করে দেহত্যাগ করেছিল তাই তার হরিণ জন্ম হলো। যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন এ-সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না।'

১৬. একের উপর পর-পর শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু ঐ "একটি" মুছে ফেললে আর কিছুই থাকে না, তেমনি "ঈশ্বররূপ" একেকে ধরে না থাকলে জীবের সবই মিথ্যা।

দুই

উপলব্ধি ; অধিকার ; সাধনা

১৭. খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলে ভক্‌ভক্ করে শব্দ হয়, কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না ; তেমনি যার ভগবান লাভ হয়নি সে-ই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে আর যে তার দর্শন লাভ করেছে সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

১৮. সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্মবস্তু আজ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নি। বেদ, পুরাণ ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু তা কেউ মুখে বলতে পারেন নি।

১৯. জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসারভাব না থাকে।

২০. যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ হয় অর্থাৎ যে যাঁকেই চায় সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে সে তাই পেয়ে থাকে।

২১. রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে; তুমি একডুবে রত্ন পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন করে ঈশ্বরদর্শন হলো না বলে হতাশ হয়ো না।

২২. পানায় ঢাকা পুকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে তোমরা বলছ, পুকুরে জল নেই। যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে তোমরা বলছ, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কেন? যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেল।

২৩. যে-পুকুরে অল্প জল তার উপর হতে আস্তে-আস্তে জল খেতে হয় নাড়াতে নেই। নাড়ালে তার ভিতর থেকে ময়লা উঠে জল ঘোলা করে ফেলবে। যদি পবিত্র হতে চাও, তবে তুমি বিশ্বাস করে সাধনা করতে থাক, মিছে শাস্ত্র বিচার, তর্ক করো না, ক্ষুদ্র মন গুলিয়ে যাবে।

২৪. মায়াকে চিনতে পারলেই মায়া আপনি পালায়; যেমন চোর বাড়ি এসেছে গেরস্থ টের পেলে চোর আপনি পালায়।

২৫. এক সাপ গুরুর উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হয়েছিল। সে হিংসা করত না, কাউকে কামড়াত না। অন্যের আঘাতের চোটে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হলো। গুরু এসে সাপের দুর্দশা দেখলেন, তিনি বললেন, বাপু, হিংসা ত্যাগ করেছ ভাল কথা কিন্তু কেউ যখন মারতে আসবে তখন ফোঁস করো। নাই-বা কামড়ালে, কিন্তু ফোঁস করতে ছেড় না। ফোঁস করতে তো দোষ নেই।

তিন

ভক্তি ও ভাব ; ব্যাকুলতা ; সিদ্ধি

২৬. যার ভগবানে ভক্তি লাভ হয়েছে তার কিরূপ ভাব হয় জান? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি ঘর, তুমি ঘরণী ; আমি রথ, তুমি রথী ; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন চালাও তেমনি চলি।

২৭. 'ধ্যানসিদ্ধ যেইজন মুক্তি তাঁর ঠাঁই'—ধ্যান-সিদ্ধ কাদের বলে জান? যারা ধ্যান করতে বসলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।

২৮. ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে সেই ভাবে ডাকলে দেখা পায়।

২৯. যাত্রার দল দেখেছ, যতক্ষণ বাজনা খচমচ করতে থাকে, 'কৃষ্ণ এস হে, কৃষ্ণ এস হে' বলে চীৎকার করে গান চলতে থাকে, কৃষ্ণের তখনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আপন মনে সাজঘরে তামাক খাচ্চে, গল্প করছে। যখন সে সব থামল, নারদ ঋষি মৃদুস্বরে প্রেমভরে গান ধরলেন 'মরি প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন', তখন আর কৃষ্ণ থাকতে পারলেন না। অমনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি আসরে নেমে

পড়লেন। সাধকের ভেতরেও সেইরূপ। যতক্ষণ সাধক 'প্রভো এস হে, প্রভো এস হে' বলে চেঁচাচ্ছে, ততক্ষণ জেনো, প্রভু সেখানে আসেন নি। প্রভু যখন আসবেন, সাধক তখন ভাবে গদগদ হবেন, আর চেঁচাবেন না। সাধক যখন ভাবে গদগদ হয়ে ডাকে, তখন প্রভু আর দেরি করতে পারেন না।

৩০. প্রেম কাকে বলে জান? যখন হরি বলতে-বলতে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই, এমন যে নিজের দেহ এত প্রিয় জিনিস, তার উপর পর্যন্ত সংজ্ঞা থাকবে না।

৩১. শাস্ত্র বেশি পড়বার দরকার নেই। বেশি পড়লে তর্কবিচার এসে পড়ে। ব্যাকুল হও, ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদ। বৈরাগ্য মানে সংসার-বিরূপতা নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

৩২. বিষয় লাভ হলো না, ছেলে হলো না বলে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় কিন্তু ভগবান লাভ হলো না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হলো না বলে এক ফোঁটা চোখের জল কজন লোকে ফেলে?

৩৩. সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবান লাভ হয়। একটি লোকের এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি সাধুর কাছে বিনীতভাবে উপদেশ চাইলে সাধু বললেন, 'ভগবানকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাস।' লোকটি বললে, 'ভগবানকে তো দেখিনি, তাঁর বিষয় কিছুই জানি না। কেমন করে ভালবাসব?' সাধু তখন বললেন, 'তুমি কাকে ভালবাস?' লোকটি বললে, 'আমার কেউ নেই, শুধু একটা মেড়া আছে ওকেই ভালবাসি।' সাধু বললেন, 'তবে ঐ মেড়ার মধ্যেই নারায়ণ আছে জেনে ওকে প্রাণ-মন দিয়ে সেবা করবে ও ভালবাসবে।' এই বলে সাধুটি চলে গেলেন। লোকটি মেড়াকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করতে লাগল।

বহুদিন পর সেই পথে যাবার সময় সাধুর সঙ্গে লোকটির দেখা হলো। সাধু প্রশ্ন করলেন, 'কেমন আছ?' সে প্রণাম করে বলল, 'আপনার কৃপায় ভালই আছি। আমি এখন মেড়ার মধ্যেই এক অপরূপ রূপ দেখতে পাই. তাঁর চার হাত। তাঁর দর্শনে বেশ আনন্দেই আছি।'

৩৪. ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয় হলো, তারপর সূর্য দেখা দেবেন ; যার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে তার ঈশ্বরদর্শন হবেই হবে।

৩৫. ভগবতীর কাছে কার্তিক, গণেশ বসে আছেন। ভগবতীর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বললেন, 'যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ ক'রে আসতে পারবে তাকে এই মালা দেব'। কার্তিক তৎক্ষণাৎ ময়ুর ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে গণেশ মাকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ ক'রে প্রণাম করলেন ; তিনি জানেন, মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড। মা প্রসন্না হয়ে গণেশের গলায় হার দিলেন।

৩৬. ওর মূর্তিতে যদি বিশ্বাস হয়ে থাকে, কেন তুমি ওকে এভাবে তিরস্কার করছ? কারও ভাবে আঘাত করতে নেই।

৩৭. ভক্ত কে? যে পাগল হয়ে ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারে। কি রকম পাগল? শ্রীমতীর মত পাগল, গোপীদের মত পাগল, শ্রীচৈতন্যের মত পাগল।

৩৮. আমি সেই সত্যকে দেখতে চাই, বুঝতে চাই। এই জগৎ-সংসার আমাদের আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু এর পেছনে আছেন ব্রহ্ম, আছেন ঈশ্বর, আছে সত্য। কিন্তু আমরা সেই সত্যকে দেখতে পাচ্ছি না।

চার

যুগধর্ম ; সর্বধর্ম সমন্বয়

৩৯. সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়।

৪০. যার পেটে যা সয়। সকলের জন্য একমত একপথ হবে কেন ?

৪১. কলিযুগে ভক্তিযোগ ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম, ভক্তিপথেই সহজে তাঁকে পাওয়া যায়।

৪২. অনন্ত মত, অনন্ত পথ। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না। তাই কারু-কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন—তারা পেটরোগা, আবার কারু সাধ অম্বল খায়, মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা আবার অধিকারীভেদ।

৪৩. নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

জীবনচর্যা প্রসঙ্গে

১. সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীর পুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্যদিকে তাকাতে পারে, বীর সাধকও তেমনি এ-সংসারে বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের দিকে চেয়ে থাকে।

২. জীবনের লক্ষ্যটা মনে রেখে তুমি সংসারে থাক। জীবনের লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বরকে মনে রেখে আমি সংসারে আছি, সংসারের সব কর্তব্য পালন করছি। আমার যা কিছু কর্ম প্রচেষ্টা সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমি তাঁরই দিকে এগিয়ে চলেছি।

৩. সংসারে থাকবে কচ্ছপের মতো; চ'রে বেড়াচ্ছে সর্বত্র কিন্তু তার মন পড়ে আছে 'আড়াতে' ডাঙাতে যেখানে তার ডিম সে রেখে দিয়েছে।

৪. মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কালো, কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভিতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

৫. তর্ক করো না। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর অন্যকে তার মতের উপর তেমনি নির্ভর করতে দাও। বৃথা তর্কে কোন ফল হবে না। ঈশ্বরের কৃপা হলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝতে পারবে।

৬. গুরু বললেন, সব বস্তুই ঈশ্বর। শিষ্য তাই বুঝলেন। পথে এক বিশাল হাতি আসছে, উপর থেকে মাহুত বলছে, 'সরে যাও, সরে যাও।' শিষ্য ভাবলেন—'আমি কেন সরে যাব? আমি ঈশ্বর, হাতিও ঈশ্বর; সুতরাং ঈশ্বরের কাছ থেকে ঈশ্বরের অমঙ্গল হবার আশঙ্কা কোথায়?' সে সরে গেল না—হাতি তাকে শুঁড়ে তুলে দূরে নিক্ষেপ করল। আহত শিষ্য গুরুর কাছে গিয়ে সব কথা বলল। গুরু বললেন, 'বেশ ভালই বলেছ, তুমিও ঈশ্বর, সেই হাতিও ঈশ্বর, কিন্তু উপর থেকে মাহুতরূপে আর একজন ঈশ্বর যে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, তার কথা তুমি শুনলে না কেন?'

৭. যার তৃষ্ণা পায় সে কি গঙ্গার জল ঘোলা বলে তখনি একটি

পুকুর কেটে জল পান করতে যায়? তেমনি যার-ধর্মতৃষ্ণা পায় নি, সে এ-ধর্ম ঠিক নয় ও-ধর্ম ঠিক—এই বলে গোলমাল করে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাকলে অত বিচাব চলে না।

৮. প্রহ্লাদেব স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান বললেন, তুমি কি বর চাও। প্রহ্লাদ বললে, ঠাকুব, আমাকে যাবা কষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে তাদেব তুমি ক্ষমা কব। তাদেব শাস্তি দিলে, তোমাকেই তো কষ্ট সহ্য কবতে হবে। কাবণ, তুমি তো সর্বভূতেই আছ।

৯. খুঁটি যে ধবে বেখেছে সে ভগবৎ প্রেমকেই আঁকড়ে ধরে বয়েছে। খুঁটি এই বিশ্বাস, এই ভগবৎ প্রেম। ভক্তিব পথই সোজাপথ। কর্মকাণ্ড খুব কঠিন, তাব চাইতে সোজা ভগবানকে ডাকা, তাকে ভালবাসা।

১০। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ কববাব জন্যই তীর্থযাত্রা। তীর্থে গিয়ে যদি ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না হলো তবে তীর্থে যাওযাব কোন ফলই হলো না। আবাব যদি ঘবে বসে ভক্তিলাভ করতে পাব তবে তীর্থে যাবাব কোন আবশ্যক নেই।

১১. হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা কবেছিল—আজ কি তিথি? হনুমান বলেছিল—আমি তিথি নক্ষত্র ওসব কিছুই জানি না। আমি কেবল বামকে জানি।

১২. আমি যতটুকু কবতে বলি তোমরা ততটুকু করতে পারবে কি? যদি ষোলটাং বললে একটাং-ও করতে পাব তবে যথেষ্ট হবে।

১৩. অমৃতেব স্বাদ যে পেয়েছে সে আর অন্য কিছু চায় না। ভাল সন্দেশ যে খেয়েছে সে চিটে গুড় খেতে চাইবে কেন?

১৪. যেমন নরম মাটিতে ছাপ বসে কিন্তু পাথরে বসে না সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা বসে, বদ্ধ জীবে বসে না।

১৫. ভক্ত শুকনো দেশলাইয়ের মতো, হরির প্রসঙ্গ হবামাত্র তার প্রাণে প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠে।

১৬. প্রেমভক্তিতে সাধক ঈশ্বরের খুব আত্মীয়ের ন্যায় বোধ করেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলত, জগন্নাথ বলত না।

১৭. প্রেম তিন রকম—উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। উচ্চ—তুমি ভাল থাকলেই হলো, আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নাই। মধ্যম—তুমিও ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি। নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাব? তুমি যেমন করে পার অমুক জিনিস আমাকে দাও।

১৮. পতঙ্গ একবার আলো দেখলে আর অন্ধকারে যায় না, পিঁপড়ে গুড়ে প্রাণ দেয়, তবুও ফেরে না। ভক্তও সেইরকম ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দেয় তবু অন্য কিছু চায় না।

১৯. পুস্তক হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না।

২০. আমার কোন চেলা নাই, আমিই সকলকার চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে ও ঈশ্বরের দাস; চাঁদা মামা সকলকারই মামা।

২১. বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগনে, ভাইপো, ভাইঝি—এই সব আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা—মায়া; আর দয়া মানে—সর্বভূতে সমান ভালবাসা।

২২. সংসারে জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি হয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বটে—তাতে আলোর ব্যাঘাত হয় না।

২৩. বাড়ির মধ্যে একজন আছেন—বাইরে থেকে কেউ তাঁকে খুড়োমশাই, কেউ তাঁকে মামাবাবু, কেউ তাঁকে মেশোমশাই বলে ডাকছে। কিন্তু তিনি ভিতর থেকে বুঝতে পারছেন যে সকলে তাঁকেই ডাকছে। ভগবানও সেইরূপ; যে তাঁকে যা ইচ্ছে বলে ডাকুক না কেন, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে।

২৪. যখন সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যায়, ভগবানের প্রতি ষোল আনা মন হয়, তাঁর উপর পূর্ণ ভালবাসা হয় তখনই রাগভক্তি। এই ভক্তিতেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

২৫. ঈশ্বর দর্শনের পর, ভক্ত তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে যে সেবা করে—তার নাম বিজ্ঞান ভক্তি।

২৬. শ্রদ্ধা বা নিষ্কাম ভক্তি। এই ভক্তিতে নিজের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না; ভগবানের প্রীতিকর কার্য করা, তাঁর সুখসম্পাদন আকাঙ্ক্ষা করাই এই ভক্তির উদ্দেশ্য।

২৭. যে ধুলোপড়া জানে, সে সাতটা সাপ গলায় জড়িয়ে রাখতে পারে; ঈশ্বর ভক্তিরূপ ধুলোপড়া শিখে সংসার কর, সংসারে নিরাপদে থাকবে।

২৮. প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়। কেউ তাতে ভাত রাঁধে, কেহ জাল করে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করে। সে কি আলোর দোষ?

২৯. যে ব্যক্তি বাপ, মা বা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিরাগী হয়ে

যায় তাকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দুদিনের বৈরাগ্য ; পশ্চিমে চাকরি জুটলে তার বৈরাগ্য চলে যায়। আবার সে বাড়ি ফিরে আসে।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে

১. ধ্যান করবে কোথায় ? কোণে, বনে আর মনে।

২. জ্ঞানের রূপ পুরুষ, ভক্তির রূপ স্ত্রী।

৩. ঈশ্বরের বাহির বাটিতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।

৪. বাঘের ভিতর ঈশ্বর আছেন সত্য কিন্তু বাঘের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৫. আত্মসমর্পণের চেয়ে সহজ সাধনা আর নেই।

৬. পানকৌড়ি জলে থাকে বটে কিন্তু তার গায়ে জল লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

৭. পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে বটে কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

৮. ময়লা মুছে ফেললে যেমন আরসিতে মুখ দেখা যায় তেমনি হৃদয় নির্মল হলে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

৯. ঝড় উঠলে অশ্বত্থগাছ বটগাছ চেনা যায় না। জ্ঞান চৈতন্য উদয় হলে জাতিভেদ থাকে না।

১০. উঁচুতে উঠলে সকলই এক সমান দেখায়। ঈশ্বরকে পেলে ভাল মন্দ আর থাকে না।

১১. লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। (অর্থাৎ এ-তিন নষ্ট না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না)

১২. ভাবের ঘরে চুরি থাকলে কিছুই হবে না। শুধু সরল বিশ্বাসেই তাঁকে পাওয়া যায়। মন, মুখ এক করতে হয়।

১৩. যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।

১৪. বালকের ন্যায় বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

১৫. পাশ না ফাঁস ; গ্রন্থ না গ্রন্থি। বিবেক বৈরাগ্যের সঙ্গে বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারের গাঁট বেড়ে যায়।

১৬. টাকা মাটি, মাটি টাকা।

১৭. মোড় ফিরিয়ে দাও—বিষয় থেকে ঘুরিয়ে ঈশ্বরমুখী কর।

১৮. মুক্তি হবে কবে ? 'আমি' যাবে যবে।

১৯. নির্লিপ্তভাবে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে।

২০. গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ গীতা গীতা বলতে বলতে 'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যায়।

২১. রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য উঠলে দেখতে পাওনা বলে কি বলবে, দিনের বেলা আকাশে তারা নেই ? সেই রকম অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখতে পাওনা বলে কি বলবে ঈশ্বর নেই ?

২২. লুকোচুরি খেলায় বুড়ী ছুঁলেই আর চোর হয়না, সেই রকম ঈশ্বর ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয়না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, তাকে আর চোর করবার যো নেই।

২৩. ছুঁচে সুতা পরাবে তো সরু কর। মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করাবে তো দীন হীন অকিঞ্চন হও।

২৪. ঈশ্বরতত্ত্বের সার হচ্ছে ঈশ্বরে প্রেমভক্তি। সেই প্রেমভক্তি মানুষকে শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ ক'রে সময় সময় অবতীর্ণ হন।

২৫. যে তাঁকে ধরে, তার পা বেতালে পড়ে না।

২৬. ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক কিন্তু ঝালে ঝোলে অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়।

২৭. ঈশ্বর সকলকার ভিতরে আছেন কিন্তু সকলে তাঁর ভিতর নাই এ জন্যই লোকের এত দুঃখ।

২৮. ভক্তি যোগে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

২৯. ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়; বালক যেমন খেলাঘর করে ভাঙে, গড়ে; তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেছেন।

৩০. ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায় ততই তাতে ভাবভক্তি হয়। সাগরের নিকট নদী যতই যায় ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।

৩১. ভক্তের 'আমি' হচ্ছে দর্পণ, সেই দর্পণে ঈশ্বরের রূপ ফুটে ওঠে। কিন্তু আরসী খুব পোঁছা চাই, ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না।

৩২. জুতা পায়ে থাকলে কাঁটার উপর দিয়ে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। ঈশ্বরে জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে থাকলে কোন ক্ষতি হয় না।

৩৩ লোহার তরবারিতে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তরবারি হয়, কিন্তু গড়নটা সেইরকমই থাকে ; তবে কিনা, তাতে আর হিংসার কাজ চলে না। সেইরকম ঈশ্বরকে ছুঁলে আকার সেইরকমই থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না।

৩৪. একজন্মেই ঈশ্বরলাভ করব ; তিনদিনে লাভ করব ; একবার নাম করব আর লাভ করব—এই রকম জোব ভক্তি চাই।

৩৫. তেল না হলে প্রদীপ যেমন জ্বলে না, ঈশ্বর না থাকলে সেইরকম মানুষ বাঁচে না।

৩৬. সমুদ্রে রত্ন আছে, যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন, সাধনা চাই।

৩৭. ভক্তিযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের নামগুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা—হে ঈশ্বর, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমাকে দেখা দাও।

৩৮. চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, গঙ্গা-যমুনা, সাতসমুদ্র জলে পূর্ণ, সে কিন্তু পৃথিবীর জল খাবে না—উঁচু হয়ে আকাশের জলের পানে চেয়ে আছে।

চতুর্থ পর্ব

সমসাময়িকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

কোন দিব্য প্রতিভাকে কাছে থেকে উপলব্ধি করা কঠিন, দূর থেকে সেই ভাস্বর জ্যোতির পূর্ণ রূপ চোখে পড়ে। তবু সমসাময়িক কালের রামকৃষ্ণ-স্মৃতিকথা থেকে কিছু অংশ এখানে উপলব্ধি করা হলো :

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল : 'কেশবচরিত', জানুয়ারি, ১৮৮৫

নববিধান।...এই স্থানে দক্ষিণেশ্বরবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের বিষয় কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। এই মহাত্মার সঙ্গে তিনি প্রথমে বেলঘরিয়ার উদ্যানে মিলিত হন। প্রথম মিলনেই উভয়ের হৃদয় এক হইয়া যায়। সাধুরাই লুপ্ত এবং গুপ্ত সাধুদিগকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র যেমন বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ধর্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা-মুসা-গৌর-শাক্য-সক্রেটিস-মহম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মনে সাধুভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার ধর্মভাবের বিনিময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। পরমহংসের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ বৈরাগ্য নীতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলা-বিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু-বালকের মতো মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্তন

করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা ইদানীং যাহা করিতেন তাহা যে উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল এ-কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে-ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? এই প্রেমযোগের কিছু অংশ সকলেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতো কেহই আদায় করিতে পারেন নাই। উভয়ের যোগে ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে-সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধান-বিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে-ধর্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন।

গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়: ১৫ই মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ

পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এ-সংযোগ দুই-দিন পরে বা দুই-দিন পূর্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে-ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্য যে-সকল আয়োজন, সে-সকল এক-এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনীত উপায়সকল যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন; অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান, সে-সকলের কি-প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসঞ্চারের সময় হইতে পথের একজন সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্তৃক অনাদৃত হয় নাই। যে-গৃহের তৃতীয় তল বা দ্বিতীয় তলে কোনদিন খোল-করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয় তল দ্বিতীয় তল এই সকল দ্বারা প্রায় সর্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি।

একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত; সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। একদিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে, তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক আপনি ভৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাঁহার মাতা, এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছাচারসম্ভূত পানভোজনাদিতে রত, পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্বথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে সম্যক নির্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, একজন হিন্দু যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্বপ্রকার ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া, সকল ধর্মপ্রবর্তকেরই সম্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহ সকল মহাত্মার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে পাইয়া কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে-সময়ে পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য হইল।......

পরমহংস রামকৃষ্ণ দিনদিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণ সহ তাঁহার বসতিস্থলে গমন করা, একপ্রকার

নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর শান্তিতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথা সমুদয় এলোমেলো, এবং মুর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেকক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহার প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচন্দ্রের কুটীরের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন, উদরপূর্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভিড় হইলে কেহ তাহার ভিতর ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ি আইসে অমনি সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে, এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ-সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন কেন? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্বে আর কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ঃ 'স্বরাজ', ১০ই চৈত্র, ১৩১৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।—রামকৃষ্ণ কে? কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত

জানি যে এই সোনার বাঙলায় এমন সোনার চাঁদ গোরাচাঁদের পর আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-চাঁদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্মল ছিল।

রামকৃষ্ণ কে? রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে বেদ পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কেন-না উহা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। উহা বোবার স্বপ্নের মতো। যে দেখে সে-ই জানে, অপরকে উহা বলিতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কে? তিনি সাধক-চূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য ,শাক্তের ভৈরব-ভাব অভেদ-সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন এমনকি তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল-অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্যধর্মের পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল ভেদ-ভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈত-বিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী, ব্রহ্মবিজ্ঞানী, ভক্ত-চূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর—নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

... ...

ভারতেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রম-ধর্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদ বিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভূমি ভারতে এক অপূর্ব সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতা লাভ ,করিবে। পরে সেই পূর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ

পৃথিবীর সকল জাতিকে নিবৃত্তির আনন্দে সম্মিলিত করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব-নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন-নূতন শক্তির টানে নূতন-নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে, এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে। কে আবাব ঐ শ্রীকৃষ্ণ-দত্ত মন্ত্রবলে এই ভেদ-বৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে।

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন্। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না, উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিছেন্। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।...

শিবনাথ শাস্ত্রী : 'আত্মচরিত'

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ্ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্মসাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার

করিয়াছেন কি-না জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্ম-সাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমনকি এইরূপ সাধন করিতে-করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাব একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেক বাব দেখিয়াছি; এমনকি অনেক দিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার্ব আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন।

সে যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম এক; রূপ ভিন্ন-ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায়-কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যেই বলিলাম, "মশাই, এই আমার একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।" অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটীতে মাথা দিয়া বলিলেন, "যীশুখ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।" আমার খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন?"

উত্তর—কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন—ঈশ্বরের অবতার কিরূপ? কৃষ্ণাদির মতো?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, সেইরূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খ্রীষ্টীয় বন্ধু—আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

রামকৃষ্ণ—সে কেমন তা জান ? আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হলো। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

ইহার পর রামকৃষ্ণের সহিত আমার মিত্রতা আরও ঘনীভূত হয়। এমন দিনও গিয়াছে আমাকে অনেক দিন দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ভবনে আসিয়াছেন।*

কৃষ্ণকুমার মিত্র

"১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম কলিকাতার অন্তর্গত সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সে-বাড়িতে ব্রহ্মসমাজ ছিল···ইহার পর এক দিন তিনি সাধারণ-ব্রহ্মসমাজ-উপাসনালয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়। সেদিন উপাসনা করিতেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সঙ্গীত করিতেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)।··· তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম কলিকাতার উত্তর দিকে পাইক-পাড়ার নিকটবর্তী সিঁথির এক উদ্যানে। উদ্যানের মালিক ছিলেন

* শিবনাথ শাস্ত্রী আরও দুইখানি গ্রন্থে রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রসঙ্গে লিখেছেন—*History of the Brahmo Samaj Vol. II.* (১৯১২) ও *Men I have seen* (১৯১৯)।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল। রাধাবাজারে তাঁহার এক দোকান ছিল। প্রতি বৎসর তাঁহার উদ্যানে ব্রহ্মোৎসব হইত। এখানে মহাসমারোহে উৎসব ও ভোজন হইত।...পরমহংসদেব প্রতি বৎসরই এই উৎসবে আসিতেন এবং আনন্দের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উদ্যানে আমি তাঁহাকে তিন-চার বার দেখিয়াছি। তিনি সকালে আসিতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। এই উদ্যানে মধ্যাহ্নকালে ভূরি-ভোজনের আয়োজন হইত। পরমহংসদেব নানা গল্প করিতে-করিতে ভোজন করিতেন। আমাদের অনেকের অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি খাইতে পারিতেন। আহারান্তে ধর্ম-প্রসঙ্গ হইত। একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, "মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন।" এই কথাটা এখনও আমার মনে আছে। আরও অনেক কথা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমার মনে নাই।

"কত ভালবাস গো মানবসন্তানে"—ব্রহ্মসঙ্গীতের এই গানটি তিনি এমন তদ্গত হইয়া গাহিতেন যে সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মকৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। গাহিতে-গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন "ওঁ ওঁ," বহুক্ষণ এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞা লাভ করিতেন।

তাঁহার এই সমাধির অবস্থা আমি অনেক বার দেখিয়াছি। তিনি ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতে আসিতেন এবং প্রেমে উন্মত্ত হইতেন।" ('আত্মচরিত,' মাঘ ১৩৪৩)

কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া কলুটোলায় শ্রীকেশবচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসেন। কলুটোলার বাড়িতে আসিয়া শুনিলেন যে, বেলঘরিয়ার সাধনকাননে তিনি ব্রাহ্ম

সাধকের সঙ্গে উপাসনা করিতে গিয়াছেন। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া একটি গাড়ি ভাড়া করিয়া বেলঘরিয়ায় যান। সেখানে উভয়ের মধ্যে ধর্মালোচনা চলিতে লাগিল। তিন-চার ঘণ্টা এইরূপে কাটিল। এই ধর্ম-প্রসঙ্গের ভিতর উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যোগের পর ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের কথা, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মের জন্য ঐকান্তিকতা, তাঁহার নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতার কথা কাগজে লিখিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের লেখা পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের মুখে তাঁহার বিশেষ ধর্মভাবের কথা শুনিয়া আমার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং অনেক শিক্ষিত লোকের মনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল। আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমি বোধহয় পাঁচ বার তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইয়াছি এবং প্রত্যেক বার চার-পাঁচ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও তাঁহাকে মধ্যে-মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি। সে-সকল কথা সব স্মরণ নাই। তবে বিশেষ-বিশেষ কথাগুলি কিছু-কিছু মনে আছে।

আমাদের আলোচনা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া আরম্ভ হইত। তিনি প্রথম আলাপনের দিনে বহুবাব জোড়াসাঁকোর কথা বলিলেন: অর্থাৎ শ্রীকেশবচন্দ্রেব মুখে উপাসনাব সময় যে একটি অপূর্ব ভাবান্তব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়, তাহা বলিলেন।

দ্বিতীয় দিবস বেলঘরিয়ার সাধনকাননে যে-সকল কথা হইয়াছিল তাহারও কয়েকটি কথা যাহা স্মরণ আছে, তাহা এক্ষণে নিবেদন করিতেছি।

পরমহংসদেব বলিলেন যে, 'আমি বেলঘরিয়ায় গিয়া দেখি যে কেশবচন্দ্র উপাসনা শেষ করিয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং আমার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে, তুমি নাকি ব্রহ্মকে দেখ এবং তাঁহার

কথা শ্রবণ কর ? সে কিরূপ ? কেশব বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মদর্শনের কথা। তাঁর কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, কেশব একজন বিশেষ ব্যক্তি, কেশবের কথা শুনিয়া আমার ভাবাবেশ হইল। আমার মর্মকে স্পর্শ করিল। একবার কেশব বলে, আমি শুনি; একবার আমি বলি, কেশব শুনে, এইরূপে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটিল।' পরমহংসদেব কমলকুটীরে প্রায়ই আসিতেন, সেখানেও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি আসিলেই আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন বহু ব্রাহ্ম সাধকদিগের নিকট বলিলেন,' যে সত্য কথা বলে না তার ধর্ম হয় না, ফাঁকি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না।' এই কথার পর প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। ভোজনের শেষ ভাগে একটি জিলিপি লইয়া মুখের সম্মুখে নাড়িতে লাগিলেন। তাহার পূর্বে তিনি বলিয়াছেন, 'আমি আর খেতে পারব না, পেটে জায়গা নাই।' কিন্তু জিলিপি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'একখানা দাও।' ত্রৈলোক্যবাবু একটু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, 'আপনার সত্য কথা রক্ষা পাইল না।' পরমহংস বলিলেন, 'যখন কোন মেলায় মানুষ যায়, গাড়িতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লাটসাহেবের গাড়ি এলেই রাস্তায় জায়গা হয়, এখন পেটে জিলিপির জায়গা হবে, এতে সত্য রক্ষায় ব্যাঘাত হবে না।'

তিনি ছিলেন খাঁটি লোক, কঠোর সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ধর্মের নামে কোন আড়ম্বর করাকে ঘৃণা করিতেন। বাহিরে গৈরিক ধারণ, মালা পরিধান ও তিলক ফোঁটা প্রভৃতি আড়ম্বর দেখিলে খুব গ্রাম্য ভাষায় তাহার নিন্দা করিতেন।

কেশবচন্দ্রের উপর পরমহংসের কোন কোন বিষয়ে প্রভাব যেমন পড়িয়াছিল, সেইরূপ পরমহংসদেবের উপর শ্রীকেশবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। দু-তিন বার পরমহংস-দেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "ব্রাহ্মদের ভিতর কেশব একজন

বিশেষ লোক, কেশব বইয়ের কথা বলে না, নিজের ব্রহ্মদর্শনের ও ব্রহ্মশ্রবণের কথা বলে।”

উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা দেখা যাইত। চুম্বক যেমন লৌহকে আকৃষ্ট করে, ইঁহারা উভয়ে উভয়কে এইরূপে আকৃষ্ট করিতেন।

শেষ বয়সে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ-বিশেষ উৎসবে যোগদান করা তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের পীড়ার সময় একদিন আসিয়া বলিলেন, ‘কেশব, তুমি যদি চলে যাও, আমি কার সঙ্গে কথা কইব?’

শ্রীকেশবচন্দ্রের তিরোধানে তিনি বিশেষভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর মন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

কেশবচন্দ্র সেন

সম্প্রতি একজন সত্যিকারের হিন্দু সাধকের সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনের গভীরতায়, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে ও সরলতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অনর্গলভাবে যে-সকল সহজ উপমা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেগুলো যেমন উপযোগী, তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার মনের গঠন দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের ঠিক বিপরীত। দয়ানন্দ তর্ক ভালবাসেন, মল্লযোদ্ধার ন্যায় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য তিনি সতত আগ্রহান্বিত ও তৎপর। পরমহংসদেবের মধ্যে এসব কিছুই নাই। তিনি অতি শান্ত ধীর, তাঁহার ভাব অন্তর্মুখীন, কথাবার্তা ও ব্যবহার অতি মধুর। যে-হিন্দুধর্ম এরূপ মহাপুরুষকে প্রেরণা যোগাইতে পারে, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই সত্য শিব ও সুন্দরের নিরতিশয় গভীর উৎস বিদ্যমান।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বহুদিন পূর্বে 'Indian Mirror'-এ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়িতে পরমহংস আসিয়াছেন। কৌতূহল বশত দেখিতে যাইলাম, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথ বাবুর বাড়িতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'সন্ধ্যা হইয়াছে?' আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে সন্ধ্যা হইয়াছে কি না।' আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধুকীর্তনীয়া তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাদেরও নমস্কার করেন না, তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করতে দেন। এ-পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্বের ইয়ার। তিনি পরমহংসদেবকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'বিধু ওঁর পূর্বের

আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।' কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'চল, আর কি দেখবে?' আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি। কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, স্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডন স্ট্রীট) চৈতন্যলীলার অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরের compound-এ বেড়াইতেছি। এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, 'পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।' আমি বলিলাম, 'তাঁহার টিকিট লাগিবে না। কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।' এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি—দেখিলাম, তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া থিয়েটারের compound মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি না নমস্কার করিতে তিনি আগে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি Box-এ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশত বাড়ি চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা 'Young Bengal' নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজি শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী। অল্প সংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া,

গিয়াছিলেন এবং কেহ-কেহ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পর প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকায় ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজিও দু-পাতা পড়িয়াছেন। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না মানার বিদ্যার পরিচয়, এ-অবস্থায় স্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে-মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে। আদি সমাজে কখনও-কখনও যাওয়া আসা করি, একটি ব্রাহ্ম-সমাজও পাড়াব কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না। ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, 'ভগবান যদি থাক' আমায় পথ নির্দেশ করিয়া দাও। ইহার কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল-বায়ু-আলো ইহ-জীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহার অর্জন রহিয়াছে; ধর্ম যাহা অনন্ত-জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান বিজ্ঞ। তাঁহারা যে-কথা বলেন সেই কথাই ঠিক। ধর্মের আন্দোলন বৃথা; এইরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। দুর্দিন আসিয়া ঠিক থাকিতে দিল না। দুর্দিনের তাড়নায় চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদমুক্ত হইবার কোন উপায় আছে কি? দেখিয়াছি অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া

থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ; এইরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য। এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপদজাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে তো মুক্ত হইলাম। কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আমার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে। ঈশ্বরকে ডাকিলে কোন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বব জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার মতো মনুষ্যকে কিরূপে ঈশ্বরজ্ঞান করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পবং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কি করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয় তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম নরবেশ ধরিয়া কখনো-কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়। তবেই, নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আমি কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এ-সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য. হোক, আর মিথ্যা

হোক, একদিন তিনি আমায় বলিলেন, 'আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো-কখনো রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে। কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।' আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ-ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশত আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছি। দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্বদিক হইতে নারায়ণ আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে-ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবা মাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনরায় নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে-ধীরে চৌমাথার দক্ষিণদিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন আমার বোধ হইতে লাগিল যেন অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, 'পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।' আমি চলিলাম। পরমহংসদেব ৺বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুই-একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি।" বলিতে-বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—'নানা ঢং নয় ঢং নয়' অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গুরু কি?' তিনি বলিলেন, 'গুরু কি জান, যেন ঘটক।' আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি। তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আবার বলিলেন, 'তোমার গুরু হয়ে গেছে।' 'মন্ত্র কি?' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'ঈশ্বরের নাম'। দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রামানুজ প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে-নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ কবায় সকল দেহে ঈশ্ববের অস্তিত্বজ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রাম নামে কবীরের মন্ত্র হইল, আর সেই নাম জপ করিয়া কবীবের সিদ্ধিলাভ হইল।' থিয়েটাবের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, —'আব একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।' আমি উত্তর করিলাম' 'যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।' তিনি বলিলেন, 'কিছু নিও।' আমি বলিলাম, 'ভালো, আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন, 'সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।' আমি উত্তর কবিলাম, 'না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।' তিনি বলিলেন 'না একটি টাকা নিও।' আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় এ-কথা শেষ হইল।

বলবামবাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটি সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ কবিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন; আমারও ইচ্ছা ছিল কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পবমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলবামবাবুব বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন দেখিলেন?' আমি বলিলাম 'বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্যে হতাশ ভাব আব নাই। ভাবিতেছি, গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হয়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি?

যে কারণে মানুষকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা এইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম—এত কেন; গুরুও মানুষ,

শিষ্যও মানুষ, তাঁদের নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে পদ-সেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিনদিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসে আছি এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, 'পরমহংসদেব আসিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'ভাল Box-এ লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?' আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না?' কিন্তু তিনি গেলেন। আমি পঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাঁহার পাদপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরমশান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই। উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়ই, আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—'ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?' Dress Circle-এর দর্শকের Concert-এর সময় বসিবার জন্য Star-এর দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেক ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু

প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেন্দ্র-বাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, 'বসুন না।' কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন ; আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব-নিমগ্ন হইলেন। একটি বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম। এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে পড়িল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমার মনে বাঁক আছে।' আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাঁক যায় কিসে?' পরমহংসদেব বলিলেন,—'বিশ্বাস করো।'

আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটি চিরকুট পাইলাম যে মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম, যে অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। আমি চলিলাম। অনাথবাবুর বাজারের নিকট গিয়া ভাবিলাম যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ি গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু

আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমি তথায় গিয়াছি? আমি বলিলাম, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।' রামবাবুর বাড়ির নিকটে সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমাকে লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সেসব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—'নদে টলমল, টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।' আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টলমল করিতেছে। আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ-আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে-করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম তাঁহার নিকট গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে-মুহূর্তে এই ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে-করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রইল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সঙ্কীর্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক যাইবে তো?' তিনি বলিলেন, 'যাইবে।' আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনিও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু রামমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরমভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমায় বলিলেন,—'যাও না, উনি বললেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত কচ্ছ?' এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্বে কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহনবাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু

ভাবিলাম, ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নাই তিনি শতবার বলিলেও তো তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বর যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বর যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণদিকের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন। অপব একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহাব সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে 'গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি, এই স্তবটিও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমি তোমাব কথাই বলিতেছিলাম: মাইরি, একে জিজ্ঞাসা কর।' পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি কিছু করিয়া দিতে পারেন করুন।' এ-কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, 'কি রে, কি শ্লোকটা, বল তো?' রামলাল দাদা শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, শ্লোকেব ভাব, পর্বতগহ্বরে নির্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে আমি নির্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে?' আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক তাঁহার চরণে অবনত হইল। এ কাহার আশ্রয় পাইলাম, যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, 'আমায় কেউ কেউ বলে, 'রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানেই থাকি।' আমি প্রণাম করিয়া বাটিতে ফিরিতেছি তিনি উত্তরের বারান্দা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি

আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'তা করো না।' তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের অধিকার নাই। তাঁহার সাধনভজন নিস্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল আমার ধারণা সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে আমি গালি দিয়াছি। শ্রীচরণসেবা করিতে দিয়াছেন ভাবিয়াছি, একি আপদ। কিন্তু এ-সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এসকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিত পাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।

নবীনচন্দ্র সেন

বেদান্তমূলক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেশববাবু তদানীন্তন খ্রীস্টধর্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে ব্রাহ্মধর্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া, উহা খ্রীস্টধর্মের স্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার "যিসাস ক্রাইস্ট ইউরোপ অ্যাণ্ড এশিয়া" বক্তৃতার পর তাঁহার খ্রীস্টান হইবার বড় বাকি নাই বলিয়া মিশনারিরা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর রামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পড়িয়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্মই 'নববিধান' নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

একেবারে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলে ২০ বৎসর যাবৎ তিনি যাহাদের হিন্দুসমাজচ্যুত করিয়া বিজাতীয় পথে লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে লাঞ্ছনার একশেষ করিবে এবং কার্যও পণ্ড হইবে বুঝিয়া তিনি ধীরে-ধীরে ব্রাহ্মধর্মে হরি, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রবেশ করাইতেছিলেন। তিনি টাউনহলের এক বক্তৃতায় প্রকাশ্য-ভাবে বলেন, 'আমরা পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা (spirit) গ্রহণ করিব এবং মূর্তি (form) অস্বীকার করিব।' তিনি আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার ভরসা ছিল যে, মূর্তিগুলি যে ধর্মশিক্ষার আকর এবং তাহাদেরও প্রয়োজন আছে, তাহা ক্রমে-ক্রমে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্কে নির্বাণ প্রদান করিয়া এবং "প্রকৃত-ধর্ম" সংস্থাপন করিয়া হিন্দুদের গৃহে ভারত-পূজিত কেশবের যুগাবতার বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হইতেন। ভারতের দূরদৃষ্ট, ভারতের ক্ষণজন্মা পুরুষেরা প্রায় সকলেই তাঁহাদের জীবনের কার্যের আরম্ভে তিরোহিত হইয়াছিলেন।

বিনোদিনী দাসী

চৈতন্যলীলা অভিনয়ের জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না।... এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন ৺পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন!

অভিনয় কার্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে-নাচিতে বলিতেন ; 'হরি গুরু, গুরু হরি'। বল মা 'হরি গুরু,

গুরু হরি।' তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপপঙ্কিল দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, 'মা, তোমার চৈতন্য হউক।' তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার ন্যায় অধমজনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি!

পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। হায়! আমি অতি ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আমি মোহতাড়িত হইয়া জীবনকে নরক-সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। তখনও রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন, 'আয় মা বোস', আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব। এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান! কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন), 'সত্যং শিবং' মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমি আমার অভিনয়ে নিযুক্ত দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে 'পরমারাধ্য, পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযূষ-পূরিত আশাময়ী বাণী—'হরি গুরু, গুরু হরি' আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি; তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে বল, 'হরি গুরু, গুরু হরি।' এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে 'বক্সে' যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি প্রবন্ধ লেখেন ; প্রবন্ধের নাম 'প্রকৃত মহাত্মা', এতে রামকৃষ্ণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে। তিনি লিখেছিলেন :

> If we remember that these utterances of Ramkrishna reveal to us not only his own thoughts but the faiths and hopes of millions of human beings, we may indeed feel hopeful about the future of that country. The consciousness of the Divine in man is there and shared by all, even by those who seem to worship idols. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time, not too distant, the great temple of future will be erected, in which the Hindus and Non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same supreme spirit—who is not far from every one of us, for in him we live and move and have our being.

Ramkrishna, His life & sayings
Maxmuller, (1823—1900)

যদি আমরা ভেবে দেখি যে এই বাণীসমূহ শ্রীরামকৃষ্ণের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চিন্তারই প্রকাশ নয়, এদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা ও বিশ্বাসের ইতিহাস, তবে আমাদের মনে হবে ঐ দেশের ভবিষ্যৎ আশাজনক। মানুষের মধ্যে যে-দিব্যানুভূতির চেতনা এই বাণীসমূহে বর্তমান, তার অংশ গ্রহণ করেছে সকলে, এমন কি যারা পৌত্তলিকতা নিয়ে আছে তারাও। দিবারাত্রি ঈশ্বরোপস্থিতির এক অবিচ্ছিন্ন চেতনা, এটাই হলো একটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র ; আমরা আশা করতে পারি, অদূরবর্তীকালে এইখানেই ভবিষ্যতের মন্দির নির্মিত হবে, এই মন্দিরে পরমাত্মার অর্চনায় হিন্দু ও অহিন্দু যুক্ত-করে এবং যুক্ত-হৃদয়ে এসে দাঁড়াবে। এই পরমাত্মা আমাদের

প্রত্যেকের হৃদয় থেকে দূরবর্তী নয়, তাঁর মধ্যে বেঁচে থেকে আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছি।

—ম্যাক্সমুলার (১৮২৩—১৯০০)

ম্যাক্সমূলার ছিলেন অদ্বৈতবাদী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞদের অধিনায়ক। 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামক গ্রন্থের লেখক ম্যাক্সমূলারের অসীম পাণ্ডিত্য ও মনস্বীতার অনেক তথ্যই আমরা জানি না।

The man whose image I here evoke was the consumation of two thousand years of spiritual life of three hundred millions people.. his soul animates modern India. He was no hero of action like Gandhi, no genius in art or thought like Goethe or Tagore. He was a little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident, outside the political and social activities of his time. But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods.

Life of Ramkrishna
Romain Rolland (1866—1944)

যে-মানবাত্মার মূর্তি আমি এখানে তুলে ধরেছি তা ত্রিশ কোটি নরনারীর দু-হাজার বছরের অধ্যাত্মজীবনের পরিণত মূর্তি! তাঁর আত্মা এখনও আধুনিক ভারতকে অনুপ্রাণিত করছে। গান্ধীর মতো তিনি কর্মবীর ছিলেন না; গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কর্মে ও কলায় নিপুণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাঁর বহির্জীবন ছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মলীলার বাইরে একটা নির্দিষ্ট আয়তনে সীমিত। কিন্তু তাঁর অন্তর্জীবন বিকশিত হয়েছিল সংখ্যাতীত মানুষ ও দেবতাকে স্পর্শ করে।

—রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬—১৯৪৪)

পঞ্চম পর্ব

স্তোত্রগীতি

(ক) রামকৃষ্ণ যে গান গাইতেন

রামকৃষ্ণ কথামৃতকার বলেছেন, 'ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই।' গান করতে-করতে তিনি ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, আবার গানের সুরেই তিনি চৈতন্য জগতে ফিরে আসতেন। কতকগুলি গান তাঁর নিজের কাছেই খুব প্রিয় ছিল। তিনি গাইতেন এমন অন্যের রচিত গানের সংখ্যা প্রায় একশো। এখানে কয়েকটি গানের অনুলিপি দেওয়া হলো :

(১)

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায় ?
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় ?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়,
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়,
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়।

(২)

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।

খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবনী
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন ?
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ।

(৩)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনী শ্যামা মাকে ;
মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিও নাক
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে।

(৪)

আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়োনাক কারুঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

(৫)

ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধজলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কুলে ।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন শান্তিরূপা মুক্তা ফলে
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে শিবযুক্তি মন চাহিলে।

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেকহলদি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে
রত্ন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে।

(৬)

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
তায় পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তেরি মনে আশা পূর্ণ এতদিনে,
সুখ-দুঃখ সমান হল, আনন্দ সাগর উথলে।

(৭)

সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়ীতে চোয়ায় ভাঁটী, পান করে মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি ব'লে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে।

(৮)

আমার মা ত্বং হি তারা—
তুমি ত্রিগুণ ধরা পরাৎপরা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকুলের কুলদাত্রী সদাশিবের মনোহরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকারা কি নিরাকারা।

(৯)

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি ;
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালীনাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি।
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা ক'রে বসে আছি।

(১০)

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালীপদ সুধাহ্রদে যদি চিত্ত ডুবে রয়—
তবে পূজা হোম যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।

এইসব গান এবং আরও অনেক গান ঠাকুর নিজে করতেন। কখনও আপন মনে, কখনও ভক্তজনের সঙ্গে। সঙ্গীতের সুরের সেই যাদুস্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে ভক্তচিত্ত অপার্থিব লোকে বিচরণ করতে থাকে, বাস্তবের বন্ধন আর তখন থাকে না। সঙ্গীত যে সাধনার উপকরণ—মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর প্রভৃতির জীবনে তা প্রমাণিত হয়েছিল !

(খ) রামকৃষ্ণের স্মরণে ভক্তরচিত সঙ্গীত

(১)

রামকৃষ্ণ চরণ সরোজে
মজরে মন মধুপ মোর—
কণ্টকে আবৃত বিষয় কেতকী
থেকো না থেকো না তাহে বিভোর।

ধর্মাধর্ম সুখদুঃখ শান্তিজ্বালা

দ্বন্দ্বখেলা মাঝে নাহি নিস্তার—

জ্ঞান কৃপাণে পরম যতনে

কাটোরে কাটোরে করম ডোর !

জনম মরণ বিষম ব্যাধি

নিরবধি কত সহিবি আর ;

প্রেম পীযূষ পিয়ো রে শ্রীপদে

ভবের যাতনা রবেনা তোর !

রামকৃষ্ণ নাম বলরে বদনে

মোহের যামিনী হইবে ভোর ;

দুঃস্বপন জ্বালা রবে না রবে না

কেটে যাবে তোর ঘুমেরি ঘোর।

সুকবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'দেবগীতি' গ্রন্থের প্রথম সঙ্গীত। প্রথম প্রকাশ—চৈত্র সংক্রান্তি ১৩১৯।

(২)

ভবসাগর—তারণ কারণ হে

রবিনন্দন—বন্ধন খণ্ডন হে

শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

●

হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে,

তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,

পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,

গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

●

মন-বারণ শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুনগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

●

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মন মানস চঞ্চল রাত্র দিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

●

রিপুসূদন মঙ্গল গায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে,
গুরুদেব দয়া দর দীন জনে ॥

●

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

●

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম মানব পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর—প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

(৩)

বঙ্গ-হৃদয়-গোমুখী হইতে
করুণা গঙ্গা বহিয়া যায়—
এসো ছুটে এসো, কে আছে মানব
শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়।

ব্যর্থ বাসনা অনল দহন,
সহিছ কত না জন্ম মরণ,
আলেয়ার পিছে ছুটিতে ছুটিতে
শ্রমজ সলিলে সিক্ত কায়—
স্নিগ্ধ সলিলে বারেক ডুবিলে
সকল জ্বালা জুড়ায়ে যায়।

জাহ্নবী তীরে তৃষ্ণাকাতর,
অন্ধ যে জন খোঁজে সরোবর,
রামকৃষ্ণ পূত গঙ্গা
ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায়—
হোক অবসান ব্যর্থ প্রয়াণ,
এসো ছুটে এসো ধরিগে পায়!

(৪)

রামকৃষ্ণ শ্যাম শ্যামা শিবে
ভেদ ভেব না আমার মন;

নামরূপের গেলাসে ঢাকা
আছেন সেই এক নিরঞ্জন।
চিনির ছাঁচে উট, হাতী, ঘোড়া,
পুতুল, পাখী, রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন লয় সে তেমন
এক চিনিতে সব গঠন ॥
ভেদ ভাবনা মন ছাড়ো না
সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখলে তবে
পাবি রে সেই মোক্ষধন ॥
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে
সকল শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তায়
কে হিন্দু ভাই কে যবন ॥
সাধ যদি তোর থাকেরে মন
পেতে সত্য সনাতন,
ভাসিয়ে দেনা দ্বেষাদ্বেষি
পর না চোখে প্রেমাঞ্জন ॥

(গ) রামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

(স্বামী বিবেকানন্দরচিত বীরবাণী থেকে)

(১)

ওঁ হ্রীং ঋতং তমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥

ওঁ হ্রীং তুমি সত্য তুমি স্থির, ত্রিগুণজয়ী অথচ নানাপ্রকার গুণের দ্বারা স্তবের যোগ্য। যেহেতু তোমার মোহ নিবারক পূজনীয় পাদপদ্ম আমি ব্যাকুলভাবে দিনরাত্রি ভজনা করি না, সেইজন্য হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়!

ভ-ক্তি র্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদ কারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

সংসার বন্ধননাশকারী ভজন, ভক্তি ও বৈরাগ্যাদি ষড়ৈশ্বর্য সেই অতি মহান ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, এই কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র প্রতিভাত হইতেছে না। অতএব, হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।

তে জ স্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে
ম-র্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

হে রামকৃষ্ণ, সত্যের পথস্বরূপ তোমাতে যাহারা অনুরক্ত, তোমাকে পাইয়াই তাহাদের সমুদয় কামনা পূর্ণ হয় সুতরাং তাহারা শীঘ্র রজোগুণকে অতিক্রম করে। মরণশীল নরলোকে অমৃতস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গকে নাশ করে। অতএব, হে দীনবন্ধো! তুমিই আমার আশ্রয়।

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণান্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণস্ত্বং জগদেক্য গম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!

হে প্রভো! মায়া দূরকারী মঙ্গলময় অতি পবিত্র তোমার 'কৃষ্ণ' (রামকৃষ্ণ) নাম পাপকেও পুণ্যে পরিণত করে। হে জগতের একমাত্র লভ্য, যেহেতু আমি নিরাশ্রয়, সেজন্য হে দীনবন্ধো। তুমিই আমার আশ্রয়। (স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'বীরবাণী' থেকে)

(২)

আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোহপ্যহহ ন জহৌ লোক কল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেহপ্যপ্রতিমমহিমা জানকী প্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥১॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয় কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিত পুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥২॥

যাহার প্রেমস্রোত চণ্ডাল পর্যন্ত অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত অর্থাৎ যিনি চণ্ডালকেও ভালবাসিতে কুণ্ঠিত হন নাই; আহা, অতিমানব স্বভাব হইয়াও লোকের কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন নাই, স্বর্গ মর্ত পাতাল এই তিন লোকেই যাহার মহিমার তুলনা নাই, যে রাম সীতার প্রাণস্বরূপ, যিনি ভক্তির সহিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কল্যাণমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥১॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে ভয়ানক প্রলয়তুল্য হুহুঙ্কার উঠিয়াছিল, তাহাকে স্তব্ধ করিয়া এবং (অর্জ্জুনের) ঘোরতর স্বাভাবিক অন্ধতম-স্বরূপ অজ্ঞান রজনীকে দূর করিয়া দিয়া শান্ত ও মধুর গীতাশাস্ত্র যিনি সিংহনাদরূপে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন সেই বিখ্যাত পুরুষ কৃষ্ণই এক্ষণে রামকৃষ্ণ রূপে জন্মিয়াছেন ॥২॥

(বীরবাণী'—বিবেকানন্দ)

(ঙ)

এই শ্লোকটি স্বামী অভেদানন্দ রচিত রামকৃষ্ণ-বন্দনা :

বিশ্বস্য ধাতা পুরুষস্ত্বমাদ্যো
ইব্যক্তেন রূপেণ ততং ত্বয়েদং
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরুদেব নিত্যম্ ॥

*

ত্বং পাসি বিশ্বং সৃজসি ত্বমেব
ত্বমাদিদেবো বিনিহংসি সর্ব্বম্ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরুদেব নিত্যম্ ॥

*

মায়াং সমাশ্রিত্য করোষি লীলাং
ভক্তান্ সমুদ্ধর্ত্তু মনন্তমূর্ত্তি !
হে রামকৃষ্ণ ! ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরুদেব নিত্যম্ ॥

*

বিধৃত রূপং নরবত্ত্বয়া বৈ
বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্ম ইহাতিগুহ্যঃ ;
হে রামকৃষ্ণ ! ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥

*

তপোহথ ত্যাগমদৃষ্টপূর্ব্বং
দৃষ্টা নমস্যন্তি কথং ন বিজ্ঞাঃ ।
হে রামকৃষ্ণ ! ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥

*

ত্বন্নাম শ্রুত্বাত্র ভবন্তি ভক্তা
বয়ন্তু দৃষ্টাপি ন ভক্তিযুক্তাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥

*

সত্যং বিভুং শান্তমনাদি রূপম্
প্রসাদয়ে ত্বামজমন্তশূন্যম্।
হে রামকৃষ্ণ। ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥

*

জানামি তত্ত্বং নহি দৈশিকেন্দ্রং
কিংবা স্বরূপং কথমেব ভাবম্।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপা-কটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥

ষষ্ঠ পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকর

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের পর দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের গঠন ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমরা অন্যত্র 'রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলীর' কথা উল্লেখ করেছি; এই মণ্ডলের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, অন্তত বার জনের উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁরা ঠাকুরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এদের গৃহাশ্রমের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিত্যনিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, বুড়ো গোপাল, কালী, শশী, শরৎ এবং হরি। এঁরা ছাড়াও ছিলেন গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৮৬৪-১৯৩৭), সারদা বা প্রসন্ন (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ১৮৬৫-১৯১৫), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ ১৮৬৭-১৯৬২) গুণনিধি (স্বামী অচ্যুতানন্দ) তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ত্যাগী জীবনের আদর্শ নিয়ে ঠাকুরের বাণী প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই ছিল তাঁর বাণী। একটি গবেষণাগারের মতো বিরাট বিচিত্র তাঁর জীবন। ঈশ্বরকে কতভাবে লাভ করা যায় সারা জীবনে যেন এই গবেষণাই তিনি করে গেছেন। নিজে সাধনা করে যে-সত্য তিনি লাভ করেছেন তাই দিয়ে গেছেন মানুষকে; তিনি বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। সে-পথেই ঈশ্বরকে পেতে চাও, চাওয়া যদি আন্তরিক হয়, সেই পথেই পাবে।

একটি ভাব আয়ত্ত করতে মানুষের কত যুগ কেটে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে একটি ভাব থেকে অন্যভাবে বিচরণ

করে গেছেন। এ-যেন ভগবানকে নিয়ে খেলা। এ-খেলার যাদুতে কত কঠিন তত্ত্বও সরস হয়ে উঠেছে, কত দুস্তর সমস্যাও সহজ মীমাংসার পথ খুঁজে পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেককেই তার ভাব এবং প্রয়োজন বুঝে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন যার পেটে যা সয়। এ-হলো আদর্শ শিক্ষকের কথা। শ্রীসারদা মা-ও বলতেন 'যাকে যেমন তাকে তেমন।' কারও উপরে জোর করে কিছু চাপাতে নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী এই পবিত্র দায়িত্ব নিয়েই গুরুদেবের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশে-বিদেশে।

এই আত্মত্যাগী কর্মযোগী সন্ন্যাসীদের তালিকায় প্রথম নাম নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩-১৯০২) ঠাকুরের শক্তির মূর্ত প্রকাশ তিনি, তাঁর শক্তিতেই শক্তিমান। স্বদেশসেবায় উৎসর্গীকৃত এই কর্মবীরের জীবন-বেদ অধ্যয়ন এখনও দেশে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়। এঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, একে অনুকরণ করা হয় না।

রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসবার কয়েক দিন মাত্র আগে ঠাকুর স্বপ্নে দেখলেন, কালীমাতা তাঁর কোলে একটি শিশুকে রেখে বলছেন—এই নাও তোমার পুত্র।

রামকৃষ্ণ বললেন, আমার পুত্র, কি বলছ তুমি? দেবীর মুখে মধুর হাসি, তিনি বলছেন, তোমার ধর্মপুত্রকে রেখে যাচ্ছি! ঠাকুর আশ্বস্ত হলেন।

রাখাল এল কিছুদিন পরে। ঠাকুর দেখেই চিনতে পারলেন। এ-হলো সেই স্বপ্নে-পাওয়া ছেলে। গৃহাশ্রমের নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হলো ব্রহ্মানন্দ স্বামী (১৮৬৩-১৯২২)।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই তারক উপলব্ধি করেছিলেন ইনিই তাঁকে ঈশ্বর-লাভের সাধনায় পথের নির্দেশ দিতে পারবেন। তিনি তাঁর

মনেপ্রাণে এই অনুভব করেছিলেন' তাঁর বাল্যের ও যৌবনের অস্পষ্ট কামনা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য ব্যক্তিত্বের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন এবং সার্থক রূপ গ্রহণ করেছে। ঠাকুরকে দেখে ইনি বুঝেছিলেন—তিনি সকল ধর্মের এক সুসম্বদ্ধ রূপ।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে জনৈক জিজ্ঞাসুর কাছে তিনি লিখেছেন—আমার গুরুদেব মানব কি অতিমানব, দেবতা অথবা স্বয়ং ঈশ্বর তা এখনও সঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি ; এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছি—তিনি এমন এক মহামানব যিনি তাঁর ব্যক্তিরূপকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পেরেছেন—যিনি শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যের অধিকারী—পূর্ণ জ্ঞান এবং অখণ্ড প্রেম যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এঁর গৃহাশ্রমের নাম তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ—১৮৫৪-১৯৩৪)

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বাবুরাম (বাবুরাম ঘোষ—স্বামী প্রেমানন্দ ১৮৬১-১৯১৮) শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। সাংসারিক কোন কলঙ্কের চিহ্ন তাঁর চরিত্র তখনও স্পর্শ করে নি—জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তিনি ছিলেন শিশুসুলভ সরলতার প্রতিমূর্তি ; জীবনের সাধারণ স্খলন-পতন সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চরিত্রের এই শুচিতা উপলব্ধি করেই তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন—ঠাকুর বলতেন—বাবুরাম মজ্জায়-মজ্জায় সাধু—কোন পাপচিন্তা তাঁর দেহ বা মন স্পর্শ করতে পারে না।

যোগীনের (যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৮৬১-১৮৯৯) বয়স যখন ষোল কি সতেরো তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। প্রথম দেখেই ঠাকুর বুঝতে পরেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথা। তিনি তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসতে বললেন। যোগীন তাঁর এই উদার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলেন—প্রায়ই তিনি তাঁর কাছে যেতেন।

একদিন যোগীন ঠাকুরের জন্য কিছু কিনতে বাজারে গেছেন। ধূর্ত দোকানী ধর্মের ভাণ করল—তিনিও তাঁকে ধার্মিক বলেই মনে করলেন; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন, দোকানী তাঁকে ঠকিয়েছে। ঠাকুর তাঁকে এই বলে তিরস্কার করলেন—'ধর্মসাধনায় এগিয়ে যেতে হলে যে মূর্খতার সাধনা করতে হবে তার কোন মানে নেই।'

নিরঞ্জন (নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ১৮৬২-১৯০৪) ছিলেন কলকাতায় একদল পরলোকচর্চাকারীর 'মিডিয়াম'। যুবক নিরঞ্জনের এই পরলোকচর্চায় উৎসাহ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—ভূত-প্রেতের কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত ভূত প্রেতই হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবানের কথা যদি ভাব, দিব্যজীবনের অধিকারী হবে। কোন্‌টি হতে চাও তুমি? নিরঞ্জন উত্তরে বলেছিলেন—নিশ্চয়ই, পরেরটাই হতে চাই।

অন্য কোন একটি উপলক্ষে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—দিনগুলি তো চলে যাচ্ছে, ভগবানের কথা ভাববে কখন? ঈশ্বর লাভ না হলে সমস্ত জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি যে কবে একাগ্র নিষ্ঠায় ঈশ্বর ভাবনায় যুক্ত হবে আমি সেই কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের আতিশয্যে ঠাকুর এক যুবকের কোলে বসে পড়ছিলেন; পরে বলেছিলেন—কতটা ওজন তুমি সইতে পার তাই পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম। এই যুবকের নাম শরৎ (শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—স্বামী সারদানন্দ ১৮৬৫-১৯২৭) এবং পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক রূপে যে ভার তাকে বইতে হয়েছিল তার জন্য প্রয়োজন ছিল অসামান্য শক্তির।

বাংলায় তিনি ঠাকুরের যে জীবন চরিত রচনা করেছেন তার নাম শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (ইংরেজি—**Sri Ramkrishna, the**

Great Master) এই গ্রন্থ সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ (শরৎ) বলেছেন—আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বাইরে কোন কিছুই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।

ঠাকুরের প্রতি শশীর (শশিভূষণ চক্রবর্তী; স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৬৩-১৯১১) আনুগত্য অতুলনীয়। নিঃস্বার্থ সেবা কাকে বলে শশী তা ভাল করেই জানতেন। তিনি ছিলেন ঠাকুরের একজন অক্লান্ত সেবক। নিঃস্বার্থ প্রেমের তিনিই ছিলেন আদর্শ। কোন প্রশ্ন না করে কোন তর্ক না তুলে, ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা না ভেবে তিনি নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

একদিন বুড়ো গোপাল (গোপালচন্দ্র ঘোষ—অদ্বৈতানন্দ ১৮২৪-১৯০৯) শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন—তাঁর ইচ্ছে, তিনি কিছু গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষমালা সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন—এখানে যে তরুণদল রয়েছেন—এদের চেয়ে বড় সন্ন্যাসী তুমি কোথায় পাবে ? তুমি এদের মধ্যেই এসব বিতরণ কর।

গোপালদাদা ঠাকুরের সামনে এক বস্তা কাপড় রাখলেন—ঠাকুর তাঁর নবীন শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এই ভাবেই ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা হয়েছিল।

গুরুসেবা কিভাবে ঈশ্বরোপলব্ধির সহায়ক হতে পারে তা লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ—···· -১৯২০) জীবনে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমানের যে সম্পর্ক ছিল—সেই সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে লাটু মহারাজ।

সারাদিনের ক্লান্তির পরে একদিন সন্ধ্যায় লাটু মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য ঠাকুর তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন—এখন যদি ঘুমোও তবে ধ্যান করবে কখন ? এর পর লাটু রাত্রির নিদ্রা বিসর্জন দিলেন। অবশিষ্ট জীবন দিনের

বেলা সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিয়ে রাত্রিতে জেগে কাটাতেন—এযেন গীতার সেই শ্লোকের প্রমূর্ত্ত রূপ—'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী' অর্থাৎ অন্য প্রাণীদের পক্ষে যা রাত্রি, সেই রাত্রিতেই সংযমী ধ্যানী জেগে থাকেন। বিবেকানন্দ বলতেন, 'লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্ময়কর সৃষ্টি!' নাম রাখতু রাম, বিহার থেকে এসেছিলেন—আধার ভালো বুঝতে পেরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ মহলে কালী (কালীপ্রসাদ চন্দ্র—স্বামী অভেদানন্দ ১৮৬৬-১৯৩৯) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবক। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ইনি আমেরিকা গিয়েছিলেন—সেখানে তাঁর প্রধান কাজ ছিল বেদান্ত শিক্ষা ও প্রচার।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন হরি (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়); স্বামী তুরীয়ানন্দ (১৮৬৩-১৯২২) ও ভগিনী নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে 'তু-ভায়া' ব'লে এঁর উল্লেখ আছে।

এঁরা সবাই অলৌকিক চরিত্র—শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর। অব[illegible] এলে সহচরদের নিয়েই আসেন—একের থেকে অন্যকে পৃ[illegible] দেখা যায়না। একই শক্তির পৃথক রূপে প্রকাশ।

বিবিধ ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের কালরেখা

১৭৭৫—রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের জন্ম।

১৭৮৭—রাজচন্দ্র মাড়ের জন্ম।

১৭৯১—রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রা দেবীর জন্ম।

১৭৯৩—রাসমণির জন্ম।

১৮৩৫—ক্ষুদিরামের গয়া গমন।

রাজচন্দ্র—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রাপ্তি।

১৮৩৬—রামকৃষ্ণের জন্ম (১৮ ফেব্রুয়ারি)।

রাজচন্দ্রর (চার কন্যা ও বিধবা রাসমণিকে রেখে) ৪৯ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

১৮৪৩—ক্ষুদিরামের মৃত্যু।

১৮৪৫—রামকৃষ্ণের উপনয়ন।

১৮৫০—রামকুমার—ঝামাপুকুরে টোল স্থাপন।

১৮৫২—রামকৃষ্ণের কলকাতায় আগমন।

১৮৫৩—সারদা দেবীর জন্ম (২২ ডিসেম্বর)।

১৮৫৪—তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ। জন্ম: ১৬ নভেম্বর)

১৮৫৫—দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির স্থাপন। হৃদয়রাম ও রামকৃষ্ণের আগমন।

১৮৫৬—রামকুমারের মৃত্যু।

১৮৫৮—রামকৃষ্ণ—কামারপুকুরে গমন।

১৮৫৯—রামকৃষ্ণের বিবাহ।

১৮৬০—রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬১—রাসমণির মৃত্যু/রামকৃষ্ণের ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট তন্ত্র শিক্ষা। যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দের জন্ম : ৩০ মার্চ) বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ। জন্ম : ১০ ডিসেম্বর)।

১৮৬৩—বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম : ১২ জানুয়ারি) নিত্যরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। জন্ম : আগস্ট) রামকৃষ্ণের তন্ত্রশিক্ষা শেষ/পদ্মলোচন পণ্ডিতের আগমন। শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। জন্ম : ১৩ জুলাই)।

১৮৬৪—বাৎসল্য ভাব (জটাধারী) মধুর ভাব/তোতাপুরী কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা/এই সময় থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস হিসাবে পরিচিত।

১৮৬৫—তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ জন্ম : ২৩ ডিসেম্বব)।

১৮৬৬—অদ্বৈততত্ত্ব শিক্ষা/ইসলাম অধ্যাত্মবাদ অনুসরণ। কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ। জন্ম : ২ অক্টোবর)।

১৮৬৭—রামকৃষ্ণ—কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৮—রামকৃষ্ণ—তীর্থযাত্রা। বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীব দর্শন।

১৮৭০—মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে ভ্রমণ/কলুটোলা হরিসভায় গমন। কালনা-নবদ্বীপ ভ্রমণ।

১৮৭১—মথুরামোহন বিশ্বাসের মৃত্যু।

১৮৭২—শ্রীসারদা মায়ের প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন। ষোড়ষী পূজা।

১৮৭৩—রামেশ্বরের মৃত্যু।

১৮৭৪—শ্রীসারদা মায়ের দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় আগমন।

১৮৭৫—কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। রামকৃষ্ণের কামারপুকুরে শেষ গমন। (গোপালচন্দ্র ঘোষ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ। প্রথম দর্শন সিঁথির বাগানে)।

১৮৭৬—চন্দ্রা দেবীর মৃত্যু।

১৮৭৮—শ্রীসারদা মায়ের তৃতীয় বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১৮৭৯—ভক্ত সমাগম সূচনা। লাটু মহারাজের (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) রামকৃষ্ণ দর্শন।

১৮৮০—রাখাল-নরেন্দ্রের আগমন।

১৮৮১—হৃদয়-এর বিদায়।

১৮৮২—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শ্রীসারদা মায়ের দক্ষিণেশ্বর অবস্থান।

১৮৮৪—কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মায়ের শেষ অবস্থান/শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বাক্যালাপ।

১৮৮৫—পানিহাটী-উৎসব শেষ দর্শন। পীড়া—শ্যামপুকুরে অবস্থান।

১৮৮৬—কাশীপুর উদ্যান বাটীতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান/শিষ্য সমন্বয়/ মহাসমাধি (১৬ আগস্ট দ্বিপ্রহর)।